বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

সিগনেট প্রেস
কলকাতা ২০

দ্বিতীয় সিগনেট সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৫
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০

পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
জিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ
২০এ গৌর লাহা স্ট্রীট

গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১ গ্রাণ্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

দাম দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

দুই বাড়ি

রামতারণ চৌধুরী সকালে উঠিয়া বড় ছেলে নিধুকে বলিলেন—নিধে, একবার হরি বাগ্দীর কাছে গিয়ে তাগাদা করে ভ্যাখ দিকি। আজ কিছু না আনলে একেবারেই গোলমাল।

নিধুর বয়স পঁচিশ, এবার সে মোক্তারী পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সম্ভবত পাশও করিবে। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, রঙ খুব ফরসা না হলেও তাহাকে এ পর্যন্ত কেউ কালো বলে নাই। নিধু কি একটা কাজ করিতেছিল, বাবার কথায় আসিয়া বলিল—সে আজ কিছু দিতে পারবে না।

—দিতে পারবে না তো আজ চলবে কি করে? তুমি বাপু একটা উপায় খুঁজে বার কর, আমার মাথায় তো আসচে না।

—কোথায় যাব বলুন না বাবা? একটা উপায় আছে—ও পাড়ার গোঁসাই-খুড়োর বাড়িতে গিয়ে ধার চেয়ে আনি না হয়—

—সেখানে বাবা আর গিয়ে কাজ নেই—তুমি একবার বিন্দুপিসীর বাড়ি যাও দিকি।

গ্রামের প্রান্তে গোয়ালাপাড়া। বিন্দু গোয়ালিনীর ছোট্ট চালাঘরখানি গোয়ালাপাড়ার একেবারে মাঝখানে। তাহার স্বামী কৃষ্ণ ঘোষ এ গ্রামের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল—বাড়িতে সাত-আটটা গোলা, পুকুর, প্রায় একশোর কাছাকাছি গরু ও মহিষ—কিছু তেজারতি কারবারও ছিল সেই সঙ্গে। দুঃখের মধ্যে ছিল এই যে কৃষ্ণ ঘোষ নিঃসন্তান—অনেক পূজামানত করিয়াও আসলে কোনো ফল হয় নাই! সকলে বলে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিন্দুর হাতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পড়িয়াছিল।

বিন্দুর উঠানে দাঁড়াইয়া নিধু ডাকিল—ও পিসী, বাড়ি আছ ?
বিন্দু বাড়ির ভিতর বাসন মাজিতেছিল, ডাক শুনিয়া আসিয়া বলিল—কে গা ? ও নিধু ! কি বাবা কি মনে করে ?
—বাবা পাঠিয়ে দিলে।
—কেন বাবা ?
—আজ খরচের বড় অভাব আমাদের। কিছু ধার না দিলে চলচে না পিসী। বিন্দু বিরক্তমুখে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল—ধার নিয়ে বসে আছি তোমার সকালবেলা। গাঁয়ে শুধু ধার দ্যাও আর ধার দ্যাও—টাকাগুলো বারোভূতে দিয়ে না খাওয়ালে আমার আর চলছে না যে ! হবে না বাপু, ফিরে যাও—
নিধু দেখিল এই বুড়িই অদ্যকার সংসার চলিবার একমাত্র ভরসা, এ যদি এভাবে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়—তবে আজ সকলকে উপবাসে কাটাইতে হইবে। ইহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিধু ডাকিল—ও পিসী শোনো একটা কথা বলি।
—না বাপু, আমার এখন সময় নেই।
—একটা কথা শোনো না।
বিন্দু একটু থামিয়া অর্ধেকটা ফিরিয়া বলিল—কি বল না ?
—কিছু দিতে হবে পিসী। নইলে আজ বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না বাবা বলে দিয়েচে।
—হাঁড়ি চড়বে না তো আমি কি করব ? এত বড়-বড় ছেলে বসে আছ চৌধুরী মশাইয়ের, টাকা-পয়সা আনতে পার না ? কি হলে হাঁড়ি চড়ে ?
—একটা টাকার কমে চড়বে না পিসী।
—টাকা দিতে পারব না। ধামা নিয়ে এস—দু-কাঠা চাল নিয়ে যাও।
—বা রে ! আর তেল-নুন মাছ-তরকারির পয়সা ?

—চাল জোটে না—মাছ-তরকারি! লজ্জা করে না বলতে? চার-আনা পয়সা নিয়ে যাও আর দু'কাঠা চাল।

—যাকগে পিসী, দাও তুমি আট-আনা পয়সা আর চাল।

বিন্দু মুখ ভারি করিয়া বলিল -তোমাদের হাতে পড়লে কি আর ছাড়ান-কাড়ান আছে বাবা? যথাসর্বস্ব না শুষে নিয়ে এ গাঁয়ের লোক আমায় রেহাই দেবে কখনো? যাও তাই নিয়ে যাও—আমায় এখন ছেড়ে দ্যাও যে বাঁচি।

নিধু হাসিয়া বলিল—তোমায় বেঁধে রাখিনি তো পিসী—টাকা ফেল—ছেড়ে দিচ্ছি।

বিন্দু সত্যিই বাড়ির ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া নিধুর হাতে দিয়া বলিল -যাও, এখন ঘাড় থেকে নেমে যাও বাপু যে আমি বাঁচি—

নিধু হাসিয়া বলে—তা দরকার পড়লে আবার ঘাড়ে এসে চাপব বৈকি!

—আবার চাপলে দেখিয়ে দেব মজা। চেপে দেখ কি হয়—

নিধু বাড়ি আসিয়া বাবার হাতে টাকা দিয়া বলিল—বিন্দুপিসীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করে টাকা নিয়ে এলাম বাবা। এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে? পিতাপুত্রের কথা শেষ হয় নাই এমন সময় পথের মোড়ে গ্রামের ছনু জেলেকে মাছের ডালা মাথায় যাইতে দেখা গেল। রামতারণ হাঁক দিলেন—ও বাবা ছনু, শুনে যা—কি মাছ ও ছনু?

ছনু জেলে ইঁহাদের বাড়ির ত্রিসীমা ঘেঁষিয়া কখনো যায় না। সে বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে এ বাড়িতে ধার দিলে পয়সা পাইবার কোনো আশা নাই। আজ রামতারণের একেবারে সামনে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। রামতারণ পুনর্বার হাঁক দিলেন—ও ছনু, শোনো বাবা - কি মাছ?

ছনু অগত্যা ঘাড় ফিরাইয়া এদিকে চাহিয়া বলিল—খয়রা মাছ—

—এদিকে এস, দিয়ে যাও—

গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেয়াদবি করা ছনুর সাহসে কুলাইল না, নয়তো মনের মধ্যে অনেক কড়া কথা রামতারণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে জমা হইয়াছিল।

সে কাছে আসিয়া ডালা নামাইয়া কহিল—কতকের মাছ নেবেন ?

—দাও আনা দুইয়ের—দেখি—বলিয়া রামতারণ চুপড়ির ভিতর হইতে নিজেই বড়-বড় মাছ বাছিয়া তুলিতে লাগিলেন। ছনু বলিল—আর নেবেন না বাবু, দু-আনার মাছ হয়ে গিয়েচে—

—বলি ফাউ তো দিবি ? দু-আনার মাছ একজায়গায় এক সঙ্গে নিচ্চি, ফাউ দিবিনে ?

মাছ দিয়া ডালা তুলিতে-তুলিতে ছনু বিনীতভাবে বলিল—বাবু, পয়সাটা ?

রামতারণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—সে কি রে ? সকালবেলা নাইনি ধুইনি, এখন বাক্স ছুঁয়ে পয়সা বার করব কি করে ? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল রে ছনু ?

ছনু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল—না, না, তা বলিনি বাবু, তবে আর দিনের পয়সাটা তো বাকি আছে কিনা। এই সবসুদ্ধ সাড়ে-চার আনা পয়সা এই দুদিনের—আর ওদিকের দরুন ন-আনা।

রামতারণ তাচ্ছিল্যের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—যা, এখন যা—ওসব হিসেবের সময় নয় এখন।

গ্রামের ভদ্রলোক বাসিন্দা যাঁরা, তাঁরা চিরকাল এইভাবে গ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর নিকট হইতে কখনো চোখ রাঙাইয়া কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ধারে জিনিসপত্র খরিদ করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন - ইহা এ গ্রামের সনাতন প্রথা। ইহার বিরুদ্ধে আপীল নাই। সুতরাং ছনু মুখ বুজিয়া চলিয়া যাইবে ইহাই নিশ্চিত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা রামতারণ চৌধুরী

কাছারীবাড়ির ডাক পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন ছনু তাহার প্রাপ্য পয়সার জন্য কাছারীতে নালিশ করিয়াছে। কাছারীর নায়েব দুর্গাচরণ হালদার—ব্রাহ্মণ, বাড়ি নদীয়া জেলায়। এই গ্রামের কাছারীতে আজ দশ-বারো বছর আছেন। নায়েবমহাশয়ের হাঁকডাক এদিকে খুব বেশি, সুবিবেচক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকায় জেলা কোর্টে আজ বছর কয়েক জুরি নির্বাচিত হইয়াছেন।

অজ্ঞ প্রজাদের কাছে তিনি গল্প করেন - বাপু হে, সাতদিন ধরে জেলায় ছিলাম—মস্ত বড় খুনী মামলা। আসামীর ফাঁসি হয়-হয়, কেউ রদ করতে পারত না। আমি সব দিক শুনে ভেবে-চিন্তে বললাম, তা হয় না, এ লোক নির্দোষ। জজসাহেব বললেন, নায়েবমশায়ের কথা ঠিক, আমি আসামীকে খালাস দিলাম, এক কথায় খালাস হয়ে গেল—

রামতারণ কিছু বলিবার পূর্বেই নায়েবমহাশয় বলিলেন—চৌধুরীমশায়, এসব সামান্য জিনিস আমাদের কাছে আসে, এটা আমরা চাইনে। ছনু বলছিল যে নাকি আপনার কাছে অনেকদিন থেকে মাছের পয়সা পাবে?

রামতারণ গলা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—তা আমি কি দেব না বলেচি?

—না, তা বলেননি। কিন্তু ও বেচারাও তো গরিব, কতদিন ধার দিয়ে বসে থাকতে পারে? দু-একদিনের মধ্যে শোধ করে দিয়ে দিন। আচ্ছা, যা, ছনু তোর হয়ে গেল, তুই যা—

ছনু চলিয়া গেলে রামতারণ বলিলেন—দেব তো নিশ্চয়ই, তবে আজকাল একটু ইয়ে—একটু টানাটানি যাচ্ছে কিনা—

—সে আমার দেখবার দরকার নেই চৌধুরীমশায়। নালিশ করতে এসেছিল পয়সা পাবে, আমি নিষ্পত্তি করে দিলাম দুদিনের মধ্যে ওর পয়সা দিয়ে দেবেন—মিটে গেল।

—দুদিন নয়, এক হপ্তা সময় দিন নায়েবমশায়, এই সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

—কত পয়সা পাবে? দাঁড়ান, সাড়ে-বারো আনা মোট বোধ হয়। এই নিন একটা টাকা—ওর দাম চুকিয়ে দিন। ও ছোটলোক, একটা কড়া কথা যদি বলে, ভদ্দরলোকের মানটা কোথায় থাকে বলুন তো? ওর দেনা শোধ করুন, আমার দেনা আপনি যখন হয় শোধ করবেন।

রামতারণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হইল নায়েব-মশায়কে তাঁহার সংসারের সব দুঃখ খুলিয়া বলেন। বলেন—নায়েবমশায় কি করব, বড় কষ্টে পড়েছি। দুবেলা খেতে অনেকগুলি পুষ্যি, বড় ছেলেটি সবে পাশ করেচে, এখনো কিছু রোজগার করে না। আমি বুড়ো হয়ে পড়েচি—জমিজমাও এমন কিছু নেই তা আপনি জানেন—যা সামান্য আছে তাতে সংসার চলে না। এই সব কারণে অনেক হীনতা স্বীকার করতে হয়, নইলে সংসার চলে না নায়েবমশায়—

মনে-মনে এই কথাগুলি কল্পনা করিয়া রামতারণের চক্ষে জল আসিল। মুখে অবশ্য তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, নায়েবমহাশয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলেন।

এমন অপমান তিনি জীবনে কখনো হন নাই—শেষে কিনা জমিদারী-কাছারীতে ছনু জেলে তাঁহার নামে করিল নালিশ।

কালে-কালে সবই সম্ভব হইয়া উঠিল—রামতারণের বাল্যকালে বা যৌবন-বয়সে গ্রামে এরূপ একটি ব্যাপার সম্ভবই ছিল না। সে দিন আর নাই।

নিধু পিতার পদধূলি লইয়া বলিল—তাহলে যাই বাবা—

রামতারণের চোখে জল আসিল। বলিলেন—এস বাবা, সাবধানে থেক। যা তা খেও না—আমি যদুবাবুকে লিখে দিলাম তিনি তোমাকে দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন, সুলুক-সন্ধান দেবেন। অত বড়লোক যদিও আজ তিনি, এক সময়ে দুজনে একই বাসায় থেকে পড়াশুনো করেচি। তিনিও গরিবের ছেলে ছিলেন, আমিও তাই। গাড়ি যেন একটু সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যায় দেখো।

কথাটা ঠিক বটে, তবে রামতারণ যে গরিব সেই গরিবই রহিয়া গিয়াছেন, যদু বাঁড়ুয্যে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিষয়-আশয় এবং নগদ টাকায় বর্তমানে মহকুমা আদালতের মোক্তার-বারের শীর্ষস্থানীয়। যদু বাঁড়ুয্যের বাড়ি প্রাসাদোপম না হইলেও নিতান্ত ছোট নয়, যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সারা টাউনের মধ্যে অমন ফ্যাসানের বাড়ি একটিও ছিল না—আজকাল অবশ্য অনেক হইয়াছে।

নিধু ফটকের সামনে গরুরগাড়ি রাখিয়া কম্পিতপদে উঠান পার হইয়া বৈঠকখানাতে ঢুকিল। মহকুমার টাউনে তার যাতায়াত খুবই কম—কারণ সে লেখাপড়া করিয়াছে তাহার মামা বাড়ির দেশ ফরিদপুরে। যদু বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে সে কখনো দেখে নাই।

সকালবেলা। পসারওয়ালা মোক্তার যদু বাঁড়ুয্যের সেরেস্তায় মক্কেলের ভিড় লাগিয়াছে। কেহ বৈঠকখানার বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ-কেহ নিজ সাক্ষীদের সঙ্গে মকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে।

নিধু ভিড় দেখিয়া ভাবিল, ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চান, তবে তাহারও মক্কেলের ভিড় কি হইবে না?

যদুবাবু সামনেই নথি পড়িতেছিলেন, নিধু গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। যদুবাবু নথি হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন--কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে আমি কুড়ুলগাছির রামতারণ চৌধুরীর ছেলে। এবার মোক্তারী পাশ করে প্র্যাকটিস করব বলে এসেছি এখানে। বাবা আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েচেন—

যদুবাবু একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—রামতারণের ছেলে তুমি? মোক্তারী পাশ করেচ এবার? লাইসেন্স পেয়েচ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাসা ঠিক আছে?

—কিছুই ঠিক নেই। আপনার কাছে সোজা আসতে বলে দিলেন বাবা। আমাদের অবস্থা সব তো জানেন—

যদুবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন - তাইতো, বাসা ঠিক করনি? তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেচ নাকি? কোথায় সেসব?

—আজ্ঞে, গাড়িতে রয়েচে।

যদুবাবু হাঁকিয়া বলিলেন--ওরে লক্ষ্মণ, ও লক্ষ্মণ, বাবুর জিনিসপত্তর কি আছে নামিয়ে আয়। বাবাজি তুমি এখানেই এবেলা খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

নিধু বিনীতভাবে জানাইল যে সে বাড়ি হইতে আহারাদি করিয়াই রওয়ানা হইয়াছে।

—এত সকালে? এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ? রাত থাকতে উঠে না খেলে তো তুমি কুড়ুলগাছি থেকে এতটা পথ গরুরগাড়ি করে আসতে পারোনি।

—আজ্ঞে, মা বললেন দধিযাত্রা করে বেরুতে হয়, তাই ঘরে পাতা দই দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে ভোরবেলা—

—হুঁ, তা বটে। তবে কথা কি জানো বাবা, সব বরাত। ও দধিযাত্রাও বুঝিনে, কিছুই বুঝিনে—বরাতে না থাকলে দধিযাত্রা কেন, তোমার ও ঘোলযাত্রা, মাখনযাত্রাতেও কিছু হবার যো নেই, বুঝলে বাবা?

কথা শেষ করিয়া যদু বাঁড়ুয্যে চারিপাশে উপবিষ্ট মুহুরী ও মক্কেল-বৃন্দের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি ঘুরাইয়া আনিলেন। পরে আবার বলিলেন—এই মহকুমায় প্রথম যখন প্র্যাকটিস করতে এসেছিলাম—সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। একটা ঘটি আর একটা বিছানা সম্বল ছিল। কেউ চিনত না, শ্যাম সাউদের খড়ের বাড়ি তিন টাকা মাসিক ভাড়ায় এক বছরের জন্য নিয়ে মোক্তারী শুরু করি। তারপর কত এল কত গেল আমার চোখের সামনে, আমি তো এখনো যাহোক টিকে আছি।

একজন মক্কেল বলিল—বাবু, আপনার সঙ্গে কার কথা? আপনার মতো পসার জেলার কোর্টে কজনের আছে?

অনেকেই মোক্তারবাবুর মন যোগাইবার জন্য একথায় সায় দিল।

যদু-মোক্তার নিধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবাজি, সারা পথ গরুর গাড়িতে এসেচ, তোমাদের গ্রাম তো নয় সেখানে যাওয়ার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া সোজা। একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর কথাবার্তা হবে এখন বিকেলে।

মহকুমার টাউন থেকে কুড়ুলগাছি পাঁচ মাইল পথ। নিধু মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে, স্বাস্থ্য তত ভালো নয়, এইটুকু পথ আসিয়াই সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যদু বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে যদুবাবু কোর্ট হইতে ফিরিলেন, গায়ে চাপকান, মাথায়

শামলা, হাতে এক তাড়া কাগজ। নিধুকে বলিলেন—চা খাও তো হে? বস, চা দিতে বলি—

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—থাক, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না কাকাবাবু।

—বিলক্ষণ, বস আসচি—

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চাকর আসিয়া নিধুকে বলিল—কর্তাবাবু ডাকচেন বাড়ির মধ্যে।

নিধু সসঙ্কোচে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল চাকরের পিছু-পিছু। যদুবাবু রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে আর একখানা পিঁড়ি পাতা।

যদুবাবু রান্নাঘরের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওগো, এই এসেচে ছেলেটি। খাবার দাও।

মোক্তারগৃহিনী আধ-ঘোমটা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেই নিধু তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি তাহার পাতে গরম লুচি, বেগুনভাজা ও আলুর তরকারি দিয়া গেলেন। নিধু চাহিয়া দেখিল যদুবাবু মাত্র এক বাটি সাবু খাইতেছেন।

নিধু ভাবিল, ভদ্রলোকের নিশ্চয় আজ জ্বর হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কাকাবাবু, আপনার শরীর খারাপ হয়েচে নাকি? সাবু খাচ্চেন যে?

মোক্তারগৃহিনী এবার জবাব দিলেন—বাবা, ওঁর কথা বাদ দ্যাও। বারোমাস সাবু জলখাবার দুবেলা।

যদুবাবু বলিলেন—হজম হয় না বাবাজি, আর হজম হয় না। আর কি তোমাদের বয়েস আছে? এই এক বাটি সাবু খেলাম, রাত্রে আর কিছু না। বড্ড খিদে পায় তো দুখানি সুজির রুটি আর একটু মাছের ঝোল। তা সব দিন নয়।

নিধু এবার সত্যিই অবাক হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শখ করিয়া যে কেউ সাবু খায়, ইহা সে দেখে নাই। তাহার বাবাও তো যতুবাবুর সমবয়সী, তিনি এখনো যে পরিমাণে আহার করেন, যতুবাবু দেখিলে নিশ্চয়ই চমকাইয়া যাইবেন।

জলযোগের পরে বাহিরের ঘরে আসিতেই চাকর ফর্সিতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। যতুবাবু তামাক টানিতে-টানিতে বলিলেন—তারপর একটা কথা জিগগেস করি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না, মোক্তারী করতে তো এলে, সঙ্গে কত টাকা এনেচ ?

নিধু প্রশ্নের উত্তর ভালো বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আজ্ঞে টাকা ? কিসের টাকা ?

—বসে-বসে খেতে হবে তো, খরচ চালাতে হবে না ?

—আজ্ঞে তা বটে। টাকা সামান্য কিছু—ইয়ে—মানে হাতে আছে কিছু। চাল এনেচি দশ সের বাড়ি থেকে—তাই খাব।

যতুবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাবাজি, একেই বলে ছেলেমানুষ। দশ সের চাল তোমার বাবা তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েচেন খাবার জন্যে। অর্থাৎ এই চাল কটা ফুরোবার আগেই তুমি রোজগার করতে আরম্ভ করে দেবে, এই কথা তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা—বাবা সেই ভেবেই দিয়েচেন।

নিধু সব কথা ভাঙিয়া বলিল না। এক টাকার ধান ধারে কিনিয়া আনিয়া নিধুর সৎমা চালগুলি কাল সারা বিকালবেলা ধরিয়া ভানিয়া কুটিয়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন। নিধুর আপন মা নাই, আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্বে নিধুর বাল্যকালেই মারা গিয়াছেন।

যতুবাবু বলিলেন—বাবা, খেজুর গাছ তেলপানা নয়। তোমার বাবা যা ভেবেচেন তা নয়। সেকাল কি আর আছে বাবাজি ? আমরা যখন প্রথম

প্রথম বসি প্র্যাকৃটিসে—সে কাল গিয়েচে। এখন ওই কোর্টের অশথতলায় গিয়ে ত্থাখো—একটা লাঠি মারলে তিনটে মোক্তার মরে। কারো পসার নেই। আবার কেউ-কেউ কোটপ্যাণ্ট পরে আসে—মক্কেল কিছুতেই ভোলে না—

নিধুর মুখে নিরাশার ছায়া পড়িতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—না, না, তুমি তা বলে বাড়ি ফিরে যাও আমি তা বলিনি। ছেলে-ছোকরা, দমবে কেন? আমি বলচি কাজ খুব সহজ নয়। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কাল গিয়েচে। লেগে যাও কাজে—আমি যতদূর পারি সাহায্য করব। তবে একটি বছর কলসীর জল গড়িয়ে খেতে হবে।

—আজ্ঞে, কলসীর জল?

—তাই। বাড়ি থেকে জমানো টাকা এনে খরচ করতে হবে বাবাজি। দশ সের চালে কুলুবে না। রাগ কোরো না বাবাজি। অবস্থা গোপন করে তোমাকে মিথ্যে আশা না দেওয়াই ভালো। আমি স্পষ্টবাদী লোক। বাসা ভাড়া দিতে পারবে কত?

—আজ্ঞে, দু-তিন টাকার মধ্যে যাতে হয় তাই করে নেব। তার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই। বাবার অবস্থা সব জানেন তো আপনি।

যদুবাবু বলিলেন—আচ্ছা, সস্তায় একটা বাসা তোমায় দেখে দেব এখন। দু-চারদিন এখান থেকে কোর্টে যাতায়াত করতে পারতে অনায়াসেই কিন্তু তাতে তোমার পসার হবে না। উকীল মোক্তার নিজের বাসায় না থাকলে সম্মান হয় না। তোমার ভবিষ্যৎটা তো দেখতে হবে!

সেদিন যদুবাবু নিধুর জন্য একটা ছোট বাসা পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়া দিলেন।

যদু বাড়ুয্যের খাতিরে নিধু দু-একটি মক্কেল পাইতে আরম্ভ করিল। নিধু বড় মুখচোরা ও লাজুক, প্রথম-প্রথম কোর্টে দাঁড়াইয়া হাকিমের সামনে কিছু বলিতে পারিত না—মনে হইত এজলাস সুদ্ধ মোক্তারের দল তাহার দিকে চাহিয়া আছে বুঝি। ক্রমে-ক্রমে তাহার সে ভাব দূর হইল। যদুবাবু তাহাকে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—ছ্যাখ, জেরা ভালো না করতে পারলে ভালো মোক্তার হওয়া যায় না। জেরা করাটা ভালো করে শেখবার চেষ্টা কর। যখন আমি কি হরিহর নন্দী জেরা করব, তুমি মন দিয়ে শুনো, উপস্থিত থেক সেখানে।

নিধু কিন্তু এক বিষয়ে বড় অসুবিধায় পড়িল।

যদুবাবুর সেরেস্তায় সকালে সে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া দেখিত—মক্কেলকে তিনি বড় মিথ্যা কথা বলিতে শেখান। আসামী, ফরিয়াদী বা সাক্ষীদের তিনঘণ্টা ধরিয়া মিথ্যা কথার তালিম না দিয়া তাঁহার কোনো মোকর্দমা তৈরি হয় না।

একদিন সে বলিল—কাকাবাবু, একটা কথা বলব ?

—কি বল ?

—ওদের অত মিথ্যা কথা শেখাতে হয় কেন ?

—না শেখালে জেরায় মার খেয়ে যাবে যে।

—সত্যি কথা যা তাই কেন বলুক না ?

—তাতে মোকর্দমা হয় না বাবাজি। তা ছাড়া অনেক সময় সত্যি কথাই ওদের বার-বার শেখাতে হয়। ওরা শিখিয়ে না দিলে সত্যি কথা পর্যন্ত

গুছিয়ে বলতে পারে না। আমাদের ওপর অবিচার কোরো না তোমরা—এমন অনেক সময় হয়, মক্কেলে বাপের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারে না কোর্টে দাঁড়িয়ে। না শেখালে চলে?

—আমাকেও অমনি করে শেখাতে হবে?

—যখন এ পথে এসেচ, তা করতে হবে বৈকি। আর একটা কথা শিখিয়ে দিই, হাকিম চটিও না কখনো। হাকিম চটিয়ে তোমার খুব ইস্পিরিট দেখানো হল বটে, কিন্তু তাতে কাজ পাবে না। হাকিম চটালে নানা অসুবিধে। মক্কেল যদি জানে, অমুক মোক্তারের ওপর হাকিম সন্তুষ্ট নয়—তার কাছে কোনো মক্কেল ঘেঁষবে না।

নিধু মাসখানেক মোক্তারী করিয়া যদুবাবুর দৌলতে গোটা পনেরো টাকা রোজগার করিল। তার বেশির ভাগই জামিন হওয়ার ফি বাবদ রোজগার। যদুবাবু দয়া করিয়া তাহাকে দিয়া জামিন-নামা সই করিয়া লইয়া মক্কেলের নিকট হইতে ফি পাওয়াইয়া দিতেন।

একদিন একটি মক্কেল আসিয়া তাহাকে মারপিটের এক মোকর্দমায় নিযুক্ত করিতে চাহিল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—অপরপক্ষে কে আছে জানো?

—আজ্ঞে যদু বাঁড়ুয্যে—

নিধু মুখে কিছু না বলিলেও মনে-মনে আশ্চর্য হইল। প্রবল প্রতাপ যদু বাঁড়ুয্যের বিপক্ষে তাহার মতো জুনিয়র মোক্তার দেওয়ার হেতু কি? লোকটি তো অনায়াসে যদু বাঁড়ুয্যের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীন মোক্তার হরিহর নন্দী কিংবা অন্নদা ঘটক অভাবপক্ষে মোজাহার হোসেনের কাছেও যাইতে পারিত?

কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে সে কোর্টে গিয়া যদু বাঁড়ুয্যেকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া ফেলিল।

যদুবাবু বলিলেন—ও, ভালোই তো বাবাজি। কিন্তু তোমার মক্কেলের মনের ভাব কি জানো না তো? আমি বুঝেচি।

—কি কাকাবাবু?

—আমি তোমাকে স্নেহ করি, এটা অনেকে জেনে ফেলেচে। তোমাকে কেস দেওয়ার মানে—আমি বিপক্ষের মোক্তার, কেসে মিটমাটের সুবিধে হবে।

—কেস মেটাতে চায়?

—নিশ্চয়ই। নইলে তোমাকে মোক্তার দিত না। অন্য মোক্তারের কথা যদি আমি না শুনি? যদি কেস চালাবার জন্যে মক্কেলকে পরামর্শ দিই? এই ভয়ে তোমাকে মোক্তার দিয়েচে। ভালো তো। ওর কাছ থেকে বেশ করে দু-চারদিন ফি আদায় কর, দু-চারদিন তারিখ পাল্টে যাক—হাতে কিছু আসুক—তারপর মিটমাটের চেষ্টা দেখলেই হবে।

—বড্ড অধর্ম হবে কাকাবাবু—আজই কেন কোর্টে মিটমাটের কথা হোক না?

—তাহলেই তুমি মোক্তারী করেচ বাবা! মাইনর পাশ করে সেকালে মোক্তারীতে ঢুকেছিলাম—আর চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ করে। তুমি এখনো কাঁচা ছেলে—যা বলি তাই শোনো। তোমার মক্কেল মিটমাটের কথা কিছু বলেচে?

—আজ্ঞে না।

—তবে তুমি ব্যস্ত হও কেন এখুনি? আগে বলুক, তারপর দেখা যাবে।

একমাস শহরে মোক্তারী করিয়া নিধু বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যদু মোক্তার বলিলেন—বাবাজি, সোমবার যেন কামাই করো না। শনিবারে যাবে, সোমবারে আসবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আসবে। নতুন প্র্যাকটিসে ঢুকে কামাই করতে নেই একেবারে।

নিধু 'যে আজ্ঞে' বলিয়া বিদায় লইয়া মোক্তার-লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া নিজের বাসায় আসিল। অনেকদিন পরে বাড়ি যাইতেছে কাল—ভাইবোনগুলির জন্য কি লইয়া যাওয়া যায়? বাবার জন্য অবশ্য ভালো তামাক খানিকটা লইতেই হইবে। মায়ের জন্যই বা কি লওয়া উচিত? সারাদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সকলের জন্যই কিছু না কিছু সস্তাদামের সওদা করিল এবং শনিবার কোর্টের কাজ মিটিলে বড় একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া হাঁটাপথে বাড়ি রওনা হইল। পাঁচ-ছ ক্রোশ পথ—গাড়ি একখানা দুই-টাকা আড়াই-টাকার কমে যাইতে চাহিবে না—অত পয়সা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে সে প্রস্তুত নয়।

বর্ষাকাল।

সারাদিন কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার, সজল বাদলার হাওয়ায় ভ্রমণে ক্লান্তি আনে না—পথের দুপাশে ঘন সবুজ দিগন্তপ্রসারী ধানখেত, আউস ধানের কচি জাওলার প্রাচুর্যে চোখ জুড়াইয়া যায়। তবে কয়দিনের বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় বড় কাদা—জোরে পথ হাঁটা যায় না মোটেই।

এক জায়গায় পথের ধারে বড় একটা পুকুর। পুকুরে অন্য সময় তত জল থাকে না, এখন বর্ষার জল পাড়ের কানায়-কানায় ঘাসের জমি ছুঁইয়া আছে, জলে কচুরিপানার নীলফুল, ওপারে ঘন নিবিড় বনঝোপে তিৎপল্লার হলুদ রঙের ফুল।

নিধুর ক্ষুধা পাইয়াছিল—সঙ্গে একটা ঠোঙায় নিজের জন্য কিছু মুড়কি কিনিয়া আনিয়াছিল। মোক্তারবাবুর যেখানে-সেখানে বসিয়া খাওয়া উচিত নয়—সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঠোঙা হইতে মুড়কি বাহির করিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিল।

বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে তাহাদের গ্রামের পাশের গ্রাম সন্দেশপুরে ঢুকিল।

সন্দেশপুর চাষা গাঁ—রাস্তার ধারে তালের গুঁড়ির খুঁটি লাগানো মক্তবঘর, মক্তবের মৌলবী সাহেব তখনো ছাত্রদের ছুটি দেন নাই—যদিও আজ শনিবার—তাহারা মক্তবঘরের সামনের প্রাঙ্গণে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে নামতা পড়িতেছে।

মৌলবী ডাকিলেন—ও নিধিরাম, শুনে যাও হে—

মৌলবী শাদা-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার চেয়েও বয়সে বড়। নিধিরামকে তিনি এতটুকু দেখিয়াছেন।

নিধিরাম দাঁড়াইয়া বলিল—আর বসব না মৌলবী সাহেব, যাই—বেলা নেই আর। এখনো ইস্কুল ছুটি দাওনি যে?

—আরে এস না—শুনে যাও।

—নাঃ, যাই।

মৌলবী সাহেব স্কুল-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া আসিয়া নিধিরামের রাস্তা আটকাইলেন।

—চল, বস না একটু। এস—ওরে একখানা টুল বের করে দে মাঠে। আরে তোমরা শহরে থাক, একবার শহরের খবরটা নিই—

নিধিরাম অগত্যা গেল বটে—তাহার দেরি সহিতেছিল না—কতক্ষণে বাড়ি পৌছিবে ভাবিতেছে না আবার এই উপসর্গ! সে ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—কি আবার খবর?

—কি খবর আমরা জানি? তুমি বল শুনি। মোক্তারি করচ শুনলাম সেদিন কার কাছে যেন। তারপর কেমন হচ্চে-টচ্চে?

—নতুন বসেচি, এখুনি কি হবে বল! যদু-মোক্তার খুব সাহায্য করচে।

—যদু-মোক্তার? ওঃ, অনেক পয়সা কামাই করে। সবই নসীব বুঝলে? মাইনর পাস করি আমরা একই ইস্কুল থেকে। অবিশ্যি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। গ্যাখ আমি কি করচি—আর যদু কি করচে!

—বাবারও তো ক্লাসফ্রেণ্ড—বাবাই বা কি করচেন তাও ছ্যাখ—

—তাই বলচি সবই নসীব। একটা ডাব খাবে?

—পাগল! শ্রাবণ মাসের সন্দেবেলা ডাব খাব কি! ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

—তুমি তো তামাকও খাও না। তোমাকে দিই কি?

—তামাক খেলেই কি তোমার সামনে খেতাম মৌলবী সাহেব, তুমি আমার বাবার চেয়ে বড়।

—তোমরা মান খাতির রেখে চল তাই—নইলে নাতির বয়সী ছোকরারা আজকাল বিড়ি খেয়ে মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে ছ্যায়। সেদিন আটঘরার দাশরথি ডাক্তারের ডাক্তারখানায় বসে আছি—

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার বেশি দেরি নাই, নিধিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি আসি মৌলবী সাহেব, সন্দের পর যাওয়ার কষ্ট হবে—সুমুখে আঁধার রাত—

—আরে, তোমাদের গাঁয়ের পাচ-ছটা ছেলে পড়ে এখ্যানে। দাঁড়াও না, নামতাটা পড়ানো হয়ে গেলেই ওরাও যাবে। এক সঙ্গে যেও।

—এখনো আজ ইস্কুল ছুটি দাওনি যে! রোজই এমন নাকি? আজ তার ওপর শনিবার।

—আরে বাড়ি গিয়ে তো চাষার ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ মারতে বসবে, নয়তো গরুর জাব কাটতে বসবে তার চেয়ে এখানে যতক্ষণ আটকানো থাকে—একটু এলেমদার লোকের সঙ্গে তো থাকতে পারে। ছুটো ভালো কথাও তো শোনে! বুঝলে না? আমার রোজই সন্দের আগে ছুটি।

সন্ধ্যার পর নিধু গ্রামে ঢুকিল।

নিজের বাড়ি পৌছিবার আগে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের

বাড়ির ঠিক সামনে সরু গ্রাম্য-রাস্তার এপাশে লালবিহারী চাটুয্যেদের যে বাড়ি সে ছেলেবেলা হইতে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে—সে বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে ! এক-আধটা আলো নয়, দোতলার প্রত্যেক জানালা হইতে আলো বাহির হইতেছে—ব্যাপার কি ?

সে বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল বৈঠকখানায় অনেক গ্রাম্য ভদ্রলোক জড় হইয়াছেন, তাহার বাবা রামতারণ চৌধুরীও আছেন তাহাদের মধ্যে। একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকলের মাঝখানে বসিয়া হাত নাড়িয়া কি বলিতেছেন।

নিধু নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ছুটিয়া আসিল নিধুর ভাই রমেশ।

—ওমা, ও কালী, দাদা বাড়ি এসেচে—দাদা—

তখন বাকি সবাই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সম্মিলিত ভাবে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। নিধুর মা আসিয়া বলিলেন—তোরা সরে যা, ওকে আগে একটু জিরুতে দে—বস নিধু, পাখা নিয়ে আয় কালী—

নিধু জিজ্ঞেসো করিল—মা কারা এসেচে ও বাড়িতে ?

—জজবাবু বাড়ি এসেচেন ছুটি নিয়ে। এবার নাকি পুজো করবেন বাড়িতে—

—লালবিহারীবাবু !

—হ্যাঁ। তোর কাকা হন, কাকাবাবু বলে ডাকবি। বড়লোক। এতে কি ?

—ভালো কথা। ওতে একটা মাছ আছে, দে-গঙ্গার বিলে ধরছিল, কিনে এনেচি।

—ও পুঁটি, তোর দাদা মাছ এনেচে—আগে কুটে ফ্যাল দিকি, পচে যাবে—বলিয়া নিধুর মা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরে

একঘটি জল ও গামছা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিয়া বলিলেন—হাত মুখ আগে ধুয়ে ফেল বাবা, বলচি সব কথা।

নিধুর আপন মা নাই, ইনি সৎমা এবং রমেশ নিধুর বৈমাত্রেয় ভাই।

রমেশ বলিল—দাদা একটা ডাব খাবে? আমি একটা ডাব এনেছিলাম বন্ধুদের গাছ থেকে।

নিধুর মা ধমক দিয়া বলিলেন—যাঃ, বর্ষাকালের রাত্তিরে এখন ডাব খায় কেউ? তারপর জ্বর হোক। তুই হাত মুখ ধুয়ে নে—আমি খাবার নিয়ে আসি—

খাবার অন্য কিছু নয়, চাল ভাজা আর শহর থেকে সে বাড়ির জন্য যে ছানার গজা আনিয়াছে তাহাই দুখানা। জলপান শেষ করিয়া নিধু কৌতূহলবশত লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ওখানে দাঁড়িয়ে কে? ভেতরে এস না—

নিধু সসঙ্কোচে বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকিতে রামতারণ চৌধুরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন—নিধু কখন এলে? এটি আমার ছেলে—এরই কথা বলছিলাম তোমাকে। মোক্তারীতে ঢুকেচে এই সবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটিই লালবিহারী চাটুয্যে—নিধু তাহা বুঝিল। সে বাবাকে ও লালবিহারীকে আগে প্রণাম করিয়া পরে একে-একে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদেরও প্রণাম করিল।

লালবিহারী চাটুজ্যে বলিলেন—বস, বস। তারপর পসার কেমন হচ্ছে?

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে, এক রকম হচ্চে। সবে তো বসেচি—

লালবিহারী পূর্বস্মৃতি মনে আনিবার ভাবে বলিলেন—তোমার মতো আমিও একদিন প্র্যাকটিস করতে বসেছিলাম বহরমপুরে। তিনবছর ওকালতি করেছিলাম। সে সব দিনের কথা আজও মনে আছে—বেশ

ভালো করে খেটো হে মক্কেলের জন্যে। ফাঁকি দিও না। তাহলেই পসার হবে। মক্কেল নিয়ে ব্যবসা তোমার মতো আমিও একদিন করেচি, জানি তো।

পুত্রগর্বে রামতারণের বুক ফুলিয়া উঠিল। এত বড় একজন লোক, একটা মহকুমার ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক—তাঁহার ছেলে নিধুর সহিত সমানে সমানে কথা কহিতেছেন। কই, আরও তো কত লোক গাঁয়ের বসিয়া আছে, কজনের ছেলে আছে—উকীল মোক্তার ?

লালবিহারী পুনরায় বলিলেন—তুমি কাল যাবে না পরশু যাবে ?

নিধু উত্তর দিল—পরশু সকালে উঠেই চলে যাব—

—তাহলে কাল আমার বাড়ি দুপুরে খেও, দু-একটা কথা বলব।

রামতারণ একবার সগর্বে সকলের দিকে চাহিয়া লইলেন। ভাবটা এইরূপ—কই, তোমাদের কাউকে তো লালবিহারী খেতে বললে না ? মানুষেই মানুষ চেনে।

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে তা বেশ।

—আমার ছেলে অরুণকে তুমি গ্যাখনি—আলাপ করিয়ে দেব এখন—সেও ল' পড়চে। সামনের বছর এম এ. দেবে। তোমার বয়সী হবে।

নিধু বলিল—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি কাকাবাবু—

নিধুর মা শুনিয়া বলিলেন—বড়লোক কি আর এমনি হয় ! মন ভালো না হলে কেউ বড়লোক হয় না। তবে কর্তা যেমন, গিন্নি কিন্তু তেমন নয়। একটু ঠ্যাকারে আছে—তা থাক, আমরা গরিব মানুষ, আমাদের তাতে কিই বা আসে যায় ! আমরা সকলের চেয়ে ছোট হয়েই তো আছি। থাকবও চিরকাল—

পরদিন সকালে রমেশ ছুটিয়া আসিয়া নিধুকে বলিল—দাদা, শিগগির এস, জজবাবুর ছেলে তোমায় ডাকচে—

নিধুদের বাহিরের ঘর নাই—তবে রোয়াকের উপর একখানা খড়ের চালা আছে, নিধু বাহিরে গিয়া দেখিল একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে চালার নিচে রোয়াকে বসিয়া কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে। নিধু ছেলেটিকে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া বসাইল। ছেলেটি বলিল—আপনাদের বাড়িতে কোনো বাংলা বই আছে?

নিধু ভাবিয়া দেখিয়া বলিল—না, বই তেমন কিছু নেই তো? বাংলা রামায়ণ মহাভারত আছে—

—ও সব না। আমার বোন মঞ্জু বড্ড বই পড়ে। তার জন্যে দরকার—সে পাঠিয়ে দিলে—

—তোমাদের বাড়ি বই নেই?

—সব পড়া শেষ। মঞ্জু একদিনে তিনখানা করে বই শেষ করে—সিমলে বান্ধব লাইব্রেরী অত বড় লাইব্রেরী তার জন্যে ফেল—বই যুগিয়ে উঠতে পারে না—

—তোমার বোন কি কলকাতায় থাকে?

—ও যে মামারবাড়ি থেকে পড়ে—এবার সেকেন ক্লাসে উঠল। সামনের বার ম্যাট্রিক দেবে। বাবা মফঃস্বলে বেড়ান, সব জায়গায় মেয়েদের হাইস্কুল তো নেই, তাই ওকে মামারবাড়ি কলকাতায় রেখেচেন পড়ার জন্যে।

দুপুরে সেই ছেলেটিই তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। নিধু উহাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল। বড়লোকের বাড়ি বটে। চক-মিলানো দোতলা বাড়ির বারান্দা হইতে দামী-দামী সুদৃশ্য ভিজা শাড়ি ঝুলিতেছে, বারান্দায় সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা ঘোরাফেরা করিতেছে, কোন ঘরে গ্রামোফোন বাজিতেছে—লোকজনে, ভিড়ে, হৈচৈয়ে সরগরম। এই বাড়িটি সে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিতেছে বাল্যকাল হইতে। কখনো ইহারা দেশে আসেন নাই—নিধু বাড়িটার মধ্যে কখনও ঢুকিয়া দেখে নাই এর আগে। বাবার মুখে সে শুনিয়াছে তাহার যখন বয়স চারি বৎসর, তখন একবার ইহারা দেশে আসিয়া ঘরবাড়ি মেরামত করে ও নতুন করিয়া অনেকগুলি ঘর বারান্দা তৈরি করে—কিন্তু সে কথা নিধুর স্মরণ হয় না।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা তাহাকে যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে তাহার সামনে ভাতের থালা রাখিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি আবার আসিয়া তাহার সামনে বসিলেন। নিধু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। মহিলাটি বলিলেন—লজ্জা করে খেও না বাবা। তোমাকে সেবার এসে দেখেছিলাম এতটুকু ছেলে, এর মধ্যে কত বড়টি হয়েচ। ও মঞ্জু, এদিকে আয় তোর দাদার খাওয়া ছাখ, এখানে দাঁড়া এসে, আমি আবার ওদিকে যাব।

মেয়েটি আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল। বলিল—বারে, আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে!

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আপনাকে বলতে হবে না—আমি ঠিক খেয়ে যাব—

মেয়ের মা বলিলেন—ওকে 'আপনি' বলতে হবে না বাছা। ও তোমার ছোট বোনের মতো—এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ি, থাকা হয় না, আসা

হয় না তাই। নইলে তোমরা প্রতিবেশী, তোমাদের চেয়ে আপন আর কে আছে? তোমার মাকে ওবেলা আসতে বোলো। বসে খাও বাবা—মঞ্জু, দাঁড়া এখানে—

গৃহিণী উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েটি বলিল—আমি মাংস এনে দিই—

—মাংস আমি খাইনে তো।

মেয়েটি আশ্চর্য হইবার সুরে বলিল—খান না? ওমা, তবে মাকে বলে আসি। কি দিয়ে খাবেন?

নিধু এবার হাসিয়া বলিল—সেজন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। এই আয়োজন হয়েছে, আমার পক্ষে এত খেয়ে ওঠা শক্ত। সঙ্গে-সঙ্গে সে ভাবিল, ইহার অর্ধেক রান্নাও তাহাদের বাড়িতে বিশেষ কোনো পূজাপার্বণ কি উৎসবেও কোনোদিন হয় না। বড়লোকেরা প্রত্যহ কি এইরূপ খাইয়া থাকে?

মহকুমায় যদু-মোক্তারের বাড়ি সে খাইয়াছে—ইহার অপেক্ষা সে অনেক খারাপ। বহুলোক সেখানে খায়—সে একটা হোটেলখানা বিশেষ।

খাওয়ার পরে সে বাহিরে আসিতেছিল, ছেলেটি তাহাকে বলিল—আসুন, আমার আঁকা ম্যাপ আর মঞ্জুর হাতে-গড়া মাটির পুতুল দেখে যান।

এই সময়ে লালবিহারীবাবু কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিলেন। নিধুকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—খাওয়া হয়েচে বাবা?

—আজ্ঞে এই উঠলাম খেয়ে।

—বেশ পেট ভরেচে তো? আমি তো দেখতে পারলুম না, মাঠে একটি পৈতৃক জমি আজ তিন-চার বছর বেদখল করেচে, তাই দেখতে গিয়েছিলুম—

—না কাকাবাবু, সেজন্যে ভাববেন না। অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেল। খুড়ীমা ছিলেন বসে—

লালবিহারীবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন—ছেলেটির নাম বীরেন, সে নিধুকে অন্তঃপুরের একটা ছোট ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার হাতে পানের ডিবা দিয়া বলিল—পান খান দাদা—আমার পুতুল দেখেননি বুঝি? দাঁড়ান দেখাই—

মঞ্জু একটা আলমারির ভিতর হইতে এক রাশ মাটির কুমির, কুকুর, রাধাকৃষ্ণ, সিপাই প্রভৃতি বাহির করিয়া বলিল—দেখুন, কেমন হয়েচে?

—ভারি চমৎকার। বাঃ—

মঞ্জু হাসিমুখে বলিল—আমাদের স্কুলে এসব তৈরি করতে শেখায়। আরও একটা জিনিস দেখাব—কাল আসবেন তো?

নিধু বলিল—না, সকালেই যেতে হবে। এখন নতুন মোক্তারীতে ঢুকে কামাই করা চলবে না। তা ছাড়া কেস রয়েচে।

—বিকেলে এসে চা খাবেন কিন্তু।

—চা তো আমি খাইনে—

—চা না খান, জলখাবার খাবেন—সেই সময় দেখাব। আসবেন কিন্তু দাদা অবিশ্যি—

এই সময় বীরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মঞ্জু কিন্তু বেশ গান করতে পারে। শোনেননি বুঝি নিধুদা? ওবেলা গান শুনিয়ে দে না মঞ্জু—

মঞ্জু বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বেশ নিঃসঙ্কোচেই বলিল—উনি ওবেলা জল খেতে আসবেন নেমন্তন্ন করেচি—সেই সময় শোনাব।

নিধু বাড়ি আসিলেই তাহার মা জিগগেস করিলেন—ভালো খেলি?

—খুব ভালো।

—কি কি খেলি বল্। গিন্নির সঙ্গে দেখা হল?

—হ্যাঁ, তিনি তো খাবার সময়ে বসেছিলেন।

—আর কার সঙ্গে আলাপ হল?

—আর ওই যে বীরেন বলে ছেলেটি, বেশ ছেলে।

আশ্চর্যের বিষয়, নিধুর মনের প্রবলতম ইচ্ছা যে সে মায়ের কাছে মঞ্জুর কথা বলে, সেটাই কিন্তু সে বলিতে পারিল না। মঞ্জুব সম্পর্কিত কোনো উল্লেখই সে করিতে পারিল না।

নিধুর মা বলিলেন—গিন্নির সঙ্গে আমার ইচ্ছে যে একটু আলাপ করি। বড়লোকের বউ আলাপ রাখা ভালো।

—তা তুমি গিয়ে আলাপ করলেই পার—তিনি কি তোমার এখানে আসবেন, তোমায় যেতে হবে।

—একা যেতে ভয় করে—

—তুমি যেন একটা কি! প্রতিবেশীর বাড়ি যাবে এতে ভয় কি? বাঘ না ভাল্লুক? তোমায় টপ করে মেরে ফেলবে নাকি?

—তুই যদি যাস, তোর সঙ্গে যাই—

—তা চল না। আমায় তো—ইয়ে ওরা বিকেলে জল খেতে বলেচে ওখানে—

নিধুর মা আগ্রহের সহিত বলিলেন—কে, কে বললে তোকে? গিন্নি বললে নাকি?

—হাঁ তাই—ওই গিয়ে ঠিক গিন্নি ছিলেন না সেখানে, তবে ওই গিন্নিই বলে পাঠালেন আর কি।

—তোকে বোধহয় গিন্নির খুব ভালো লেগেচে—

মায়ের এই সব কথা বড় অস্বস্তিকর। নিধু দেখিতেছে চিরকাল তার মায়ের ব্যাপার—বড়লোক দেখিলে অত ভাঙিয়া-নুইয়া পড়িবার যে কি আছে! তাহাকে ভালো লাগিলেই বা কি, উহারা তো তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে যাইতেছে না! সুতরাং ভাবিয়া লাভ কি এসব কথা? মুখে উত্তর দিল—তা কি জানি! হয়তো তাই।

নিধুর মা সগর্বে বলিলেন—ভালো লাগতেই হবে যে! না লেগে উপায় কি ?

নাঃ, মা'র জ্বালায় আর পারিবার যো নাই। এত সরল আর ভালোমানুষ লোক হইলে আজকালকার কালে জগতে তাহাকে লইয়া চলাফেরা করাও মুশকিল।

পৃথিবীতে যে কত খারাপ, জুয়াচোর, বদমাইস লোক থাকে, নিধুর ইতিপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না সে সম্বন্ধে। কিন্তু সম্প্রতি মোক্তারীতে ঢুকিয়া সে দেখিতেছে। মা'র মতো সরলা এ পৃথিবীতে চলে না।

বেলা ছটার সময় বীরেন বাহির হইতে ডাকিল—নিধু-দা, আসুন—ও নিধু-দা—

নিধু বাহিরে আসিতেই বলিল—দেরি করে ফেললেন যে! মঞ্জু কতক্ষণ থেকে খাবার সাজিয়ে বসে—আমায় বললে ডাক দিতে।

নিধুর মনে হঠাৎ বড় আনন্দ হইল। এ অকারণ পুলকের হেতু প্রথমটা সে নির্ণয় করিতে পারিল না—পরে ভাবিয়া দেখিল, মঞ্জু তাহার জন্য খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এই কথাটা তাহার আনন্দানুভূতির উৎস।

—বেশ দাদা, এই বুঝি আপনার বিকেল ?

নিধু রোয়াকের একপাশে গিয়া গো-চোরের মতো বসিল। এবার সে আরও বেশি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—কারণ বিকালে আরও দু-তিনটি মহিলা সাজগোজ করিয়া এদিক-ওদিক ত্রস্ত লঘুপদে ঘোরাফেরা করিয়া সংসারের ও রান্নাঘরের কাজকর্ম দেখিতেছেন।

—চা খাবেন না ঠিক ?

—না শরীর খারাপ হয় খেলে। অভ্যেস নেই তো—

—তবে থাক। একটু সরবৎ করে দেব ?

—ও সবের দরকার নেই, থাক। কিন্তু আমি সেই জন্যে আরও এলাম—

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি জন্যে ?

এটা মঞ্জুর ভান। নিধু কি বলিতেছে তাহা সে কথা পাড়িতেই বুঝিয়াছে।

নিধু বলিল—তোমার গান শুনব—তা ছাড়া আমার মা আসবেন এক্ষুনি—

—জ্যাঠাইমা! বাঃ একথা তো বলেননি এতক্ষণ ?

মঞ্জু মাকে ডাক দিয়া বলিল—ওমা, শুনচো জ্যাঠাইমা পাশের বাড়ির, আজ এক্ষুনি আসবেন আমাদের বাড়ি। গিয়ে নিয়ে আসব ?

—না, তোকে যেতে হবে কেন ? তুই বরং নিধুকে খাবার দে—পাশের বাড়ি, তিনি ঠিক আসবেন এখন।

মঞ্জু নিধুকে খাবার দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই আবার আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন ক্লাসে পড় ?

—সেকেন ক্লাসে।

—কোন স্কুলে ?

—সিমলে গার্লস হাইস্কুল।

নিধু শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে কখনো মেশে নাই। এসব পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়া দূরের কথা অনেকে বাংলা লেখাপড়াই ভালো জানে না। নিধুর মনে হইল সে এমন একটি জিনিস দেখিতেছে, যাহা সে কখনো পূর্বে দেখে নাই। তাহার মনে চিরকাল সাধ ছিল ভালো লেখাপড়া শিখিবে—কিন্তু দারিদ্র্য বশত সে সাধ পূর্ণ হইল না। তবুও লেখাপড়ার কথা বলিতে সে ভালোবাসে। এ পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়াজানা লোক নাই, কলা কুমড়া চাষের কথা শুনিতে বা বলিতে তাহার ভালো লাগে না। অথচ এখানকার গ্রাম্য মজলিসে ওসব কথা ছাড়া অন্য বিষয়ের আলোচনা করিবার লোক নাই।

নিধু বলিল—আচ্ছা, তোমার হিষ্ট্রি আছে ? এ্যাডিশনাল কি নিয়েচ ?

—এ্যাডিশনাল হিষ্ট্রি ই তো নিয়েচি আর সংস্কৃত।

—অঙ্কে না ?

—উঁহু, ও সুবিধে হয় না আমার।

নিধু হাসিয়া বলিল—আমার মতন। আমারও তাই ছিল ম্যাট্রিকে। অঙ্ক আমারও তত সুবিধে হত না।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—সেদিক থেকে বেশ মিলেচে বটে! আপনি কোন বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন ?

—আজ ছ-বছর হল—

—কোথায় পড়তেন ?

—মামারবাড়ি থেকে।

এই সময় মায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া নিধু ব্যস্তভাবে বলিল—মা এসেচেন—

মঞ্জু বলিল—আপনি থান—আমি দেখচি—

খানিক পরে গিন্নির সহিত নিধুর মাকে রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে বসিয়া কথা বলিতে দেখা গেল। নিধুর মা অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কথা বলিতেছেন, পাছে তাঁহার কথার মধ্যে অত বড়লোকের গিন্নি কোনো দোষ ত্রুটি ধরিয়া ফেলেন এই ভয়েই যেন তিনি জড়সড়।

গিন্নি বলিলেন—আচ্ছা এখানে ম্যালেরিয়া কেমন ?

নিধুর মা বলিলেন—আছে বই কি দিদি। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া—

—এখানে বারোমাস কিন্তু বাস করা চলে না, যাই বলুন—

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না দিদি, আমরা কি তার যুগ্যি ? আপনি বয়সেও বড়, মানেও বড়।

গিন্নি খুশি হইয়া বলিলেন—সে আবার কি কথা ? আচ্ছা তাই হবে। তুমিই বলব এর পরে—

নিধুর মা বলিলেন—আপনি বলচেন বারোমাস বাস করা চলে না—বাস না করে যায় কোথায় সব ? এ গাঁয়ে কারো কি ক্ষমতা আছে ?

—সে যাই বল। আমি তো এই সাতদিনও আসিনি, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়েচি। ওঁকে বলছিলাম চল এখান থেকে যাই—উনি বলেন পৈতৃক ভিটেটা—এবার পুজোটা করব ভেবেচি—তা আমি বলি—চোখ-কান বুজে থাকি একটা মাস, আর কি করব ?

—আপনারা রাজা লোক দিদি, আপনাদের কথা আলাদা। আমরা আর যাব কোথায়, তেমন ক্ষমতাও নেই, সুবিধেও নেই। কাজেই কাদায় গুণ পুঁতে পড়ে থাকা—

—ওঁকে বলি, বালিগঞ্জে একটা বাড়ি করে ফেল এই বেলা।

—সে কোথায় দিদি ?

—বালিগঞ্জ কলকাতায়। খুব ভালো জায়গা। আমার কাকা আলিপুরে বদলি হলেন এবার—সবজজ ছিলেন দিনাজপুরে—আমায় বললেন হৈম, জামাইকে বল আমার বাড়ির পাশে একটু জমি নিয়ে বাড়ি করতে। কাকা আজ বছর দুই বাড়ি কিনেচেন কিনা বালিগঞ্জে, দুই খুড়তুতো ভাই বড় চাকরী করে, একজন মুন্সেফ, একজন সবডেপুটি—খুব বড় ঘরে বিয়েও হয়েচে দুজনের। দান সামিগ্রি আর ফার্নিচার দুখানা ঘরে ধরে না—

এই সময় মঞ্জু আসিয়া নিধুর মাকে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। গিন্নি বলিলেন—এটি আমার বড় মেয়ে। কলকাতায় পড়ে—

নিধুর মা মঞ্জুর দিকে চাহিলেন এবং সম্ভবত তাহার সাজগোজের পারিপাট্য ও রূপের ছটায় এমন আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে আশীর্বাদ থাক, কোনো কিছু কথা পর্যন্ত বলিতে ভুলিয়া গেলেন।

গিন্নি বলিলেন—নিধুকে খাবার দিয়েচিস ?

মেয়ে বলিল—নিধুদা খাচ্চে বসে। খুড়ীমা, আপনি চা খান তো ?

নিধুর মা বলিলেন—না মা, চা খাওয়ার অভ্যেস তো নেই।

নিধুর মায়ের প্রত্যেক কথায় ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল যেন ইহাদের বাড়ি আসিয়া এবং ইহাদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

মঞ্জু খানিকটা নিধুর মা'র কাছে থাকিয়া আবার নিধুর কাছে চলিয়া গেল। বীরেন সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

বীরেন মঞ্জুকে দেখিয়া বলিল—নিধুদা তোকে কি গান করতে বলেচেন—

নিধু বলিল - ও বেলা বলেছিলে যে! জল খাওয়ার সময়ে গান করবে—

মঞ্জু বেশ সহজ সুরে বলিল—বেশ করব এখন। খুড়ীমা তো শুনবেন—ওঁরা গল্প করচেন যে।

—আমি মাকে ডাকব ?

—না, না, এখন থাক! আমি করব এখন গান, ততক্ষণ এঁদের গল্প হয়ে যাক।

নিধুর আগ্রহ বেশি হইতেছিল—মেয়েদের মুখে গান সে কখনো শোনে নাই। এ সব দেশে মেয়েরা গান গাহে না। মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া পুরুষের সামনে গাহিতেছে, এ একটা নূতন দৃশ্য যাহা সে কখনো দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু সত্যিই হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিল। অনেক-গুলি গান। তাহার কোনো লজ্জা সঙ্কোচ নাই, বেশ সহজ, সরল ব্যবহার। নিধুর মা তো একেবারে মুগ্ধ। মেয়েটির দিক হইতে তিনি আর চোখ ফিরাইতে পারেন না।

গান যে ধরনের, সে ধরনের গান তিনি কখনো শোনেন নাই—অনেক

জায়গায় কথা বুঝিতে পারা যায় না—কি লইয়া গান—তাহাও বোঝা যায় না। শ্যামা-বিষয় বা রামপ্রসাদী গান নয়। দেহতত্ত্বও নয়। অবিশ্যি এতটুকু মেয়ের মুখে দেহতত্ত্বের গান ভালোও লাগিত না।

শুনিতে-শুনিতে নিধুর মায়ের মনে হইল—তিনি যেন কোথায় মেঘলোকে চলিয়া যাইতেছেন উড়িয়া। সেখানে যেন বাল্যকালে তাঁহার বাপের বাড়িতে যেমন ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শুকনো ধুরফুলের উড়ন্ত পাপড়ি ধরিয়া আনন্দ পাইতেন—বাবুর-হাটের সেই পুকুরের ধারে, সেই ফুলগাছতলায় বসিয়া বারো বছরের বালিকাটির মতো আবার ধুরফুলের পাপড়ি ধরিতেছেন—আবার সেই আনন্দভরা বাল্যকাল তাঁহার স্নেহময় পিতাকে লইয়া ফিরিয়াছে, যে পিতার মুখ মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এখন আর ফোটে না। কথাবার্তাও অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

নিজের অজ্ঞাতসারে কখন নিধুর মা'র চোখে জল আসিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হারমোনিয়মের আওয়াজ পাইয়া পাড়ার আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিতে সাহস না করিয়া দরজার সামনে ভিড় করিতেছে দেখিয়া মঞ্জু বীরেনকে বলিল—দাদা, ওদের ডেকে নিয়ে এস বাড়ির মধ্যে—

নিধুও মুগ্ধ। মঞ্জুর মুখের গান শুনিয়া তাহার মনে হইল এ এমন এক ধরনের জীবন, যাহার মধ্যে সে এই প্রথম প্রবেশ করিল। জীবনে এত ভালো জিনিসও আছে! শুধু সাক্ষী শেখানো, কেস সাজানো, যত-মোক্তারের ব্যবসার সম্বন্ধে উপদেশ—মক্কেল ও হাকিমকে তুষ্ট রাখিবার নানা কলাকৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা—বাড়ির দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ—এ সবের ঊর্ধ্বেও এমন জগৎ আছে—আকাশ যেখানে নীল, সূর্যোদয় অরুণরাগারক্ত, সারাদিনমান বিহঙ্গ কাকলীমুখর। যেখানে উদ্বেগ নাই, গাউনপরা উকীল-মোক্তারের ভিড় নাই, হাকিমদের গম্ভীর গলার

আওয়াজ নাই, জেরায় প্রতিপক্ষের মোক্তারের ধূর্ত চোখের দৃষ্টি নাই। নিধু বাঁচিল, সে বাঁচিয়া গেল আজ, জগতের সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস বদলাইয়া গেল—সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সে খুঁজিয়া পাইল এতদিনে।

ইতিমধ্যে কখন নিধুর ছোট ভাই রমেশ আসিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

নিধু বলিল—তুই কখন এলি রে?

রমেশ হাসিয়া বলিল—এই এলাম -

আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল - দিদির গলা শুনে—একবার ভাবলাম যাব কি না যাব, তারপর আর পারলাম না—

নিধু বলিল—তা আসবিনে কেন? বেশ করেচিস -

সে আরও তৃপ্তি পাইল যে তাহার মা ও রমেশ এমন গান শুনিতে পাইল, কখনো শোনে না তো এ সব!

মঞ্জু বলিল—আপনার ছোট ভাই বুঝি?

নিধু ঘাড় নাড়িল।

—পড়ে?

—পড়ার সুবিধে হয় না এখানে, তবে ওকে মামারবাড়ি রেখে কিংবা নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে এবার পড়াব—খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

—আমরা যদি কলকাতায় বাড়ি করি, আমাদের বাড়িতে রেখে দেবেন না?

মঞ্জুর উদারতায় নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। এ রকম কেহ বলে না। মঞ্জু ছেলেমানুষ, মন এখনো সরল—তাই বোধ হয় বলিল। পরের ঝঞ্ঝাট কে সহজে আজকাল ঘাড়ে করিতে চায়?

রমেশ লজ্জায় ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

বীরেন বলিল—রমেশ, ফুটবল খেলতে পার? একটা ফুটবল টিম করব ভাবচি।

নিধু রমেশের হইয়া উত্তর দিল—ফুটবল এখানে কে খেলবে? অনেকে চোখেও দেখেনি। তবে ও খেলা শিখে নিতে পারবে চট করে। গাছে উঠতে, সাঁতার দিতে, দৌড়াদৌড়িতে ও খুব মজবুত।

বাড়ি ফিরিয়া পর্যন্ত নিধুর মায়ের মন ছটফট করিতে লাগিল, জজবাবুর বাড়ি যে তিনি ও তাঁহার ছেলেরা এত খাতির পাইয়া আসিলেন, কথাটা কাহার কাছে গল্প করেন!

তাঁহার জীবনে এত বড় সম্মান আর কখনো কেহ তাঁহাকে দেয় নাই। ওদের দরের লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেনই বা কবে?

পুকুরের ঘাটে গা ধুইতে গিয়া দেখিলেন পুবপাড়ার প্রৌঢ়া জগোঠাকরুণ বাসন মাজিতেছেন।

জগোঠাকরুণ গর্বিতা ও ঝগড়াটে প্রকৃতির বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার উপর জগোঠাকরুণের অবস্থাও ভালো। কিন্তু কথাটা যে না বলিলেই নয়। নিধুর মা সহজভাবে ভূমিকা ফাঁদিলেন।

—ও দিদি, আজ যে এত দেরিতে বাসন মাজচ?

জগোঠাকরুণ বাসনের দিকে চোখ রাখিয়াই বলিলেন—সময় পাইনি। আজ ওবেলা দুজন কুটুম্ব এল বাড়িতে, তাদের জন্যে রান্নাবান্না করতে দেরি হয়ে গেল। তারপর বড় ছেলে এসে বললে—মা, খাবার তৈরি করে দাও, আটঘরার হাটে যাব। এই সব করতে বেলা গেল একেবারে—

নিধুর মা বলিলেন—আমারও আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল। অন্য দিন এর আগেই ঘাট সেরে চলে যাই—

জগোঠাকরুণ চুপ করিয়া আপন মনে বাসন মাজিতে লাগিলেন।

নিধুর মা পুনরায় বলিলেন—মঞ্জু কি চমৎকার গান করলে দিদি!

জগোঠাকরুণ মুখ তুলিয়া বলিলেন—কে?

—ওই যে জজবাবুর মেয়ে মঞ্জু। ওরা আজ খুব খাতির করেচে নিধুকে।

ওকে চা দিয়ে খাবার দিয়ে জজবাবুর মেয়ে নিজে কাছে বসে গান শোনালে। বেশ লোক জজগিন্নিও—তিনি তো ভারি ব্যস্ত, বল্লেন—নিধুকে আগে দে জলখাবার, ও আমার ছেলের মতো। আমায় তো কাছে বসিয়ে কত সুখদুঃখের কথা—

কথাটা জগোঠাকরুণের তেমন ভালো লাগিল না।

তিনি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—বাদ দাও ওসব বড়মানুষের কথা। বলে, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ। কারু বাড়ি যাইওনে, সময়ও নেই। ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি আমার সাজে? তুমি বড়লোক আছ, বড়লোক আছ। আমি কেন যাব তোমার বাড়ি খোশামোদ করতে? আমার ও স্বভাব নেই—তা তোমরা বুঝি দেখা করতে গিয়েছিলে?

—ওমা, এমনি দেখা করতে যাব কেন? নিধুকে যে জজবাবু নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা কত যত্ন করে খাওয়ালে। আবার বিকেলে জলখাবারের নেমন্তন্ন করলে তার ওপর। নিধু তো লাজুক ছেলে—কিছুতেই যাবে না, ওরাও ছাড়বে না। শেষে জজবাবুর ছেলে নিজে এসে আমাকে, নিধুকে ডেকে নিয়ে গেল। একেবারে নাছোড়বান্দা—

জগোঠাকরুণ সংক্ষেপে বলিলেন—বেশ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। পরে নিধুর মা-ই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—না, বেশ লোক কিন্তু ওরা।

জগোঠাকরুণ মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন—কি জানি বাপু, কারো ছন্দাংশেও কোনদিন থাকিনি—থাকবও না। বেশ হোক, খারাপ হোক, যারা আছে, তারাই আছে। মেয়েটার নাম কি বললে?

—মঞ্জু। কি চমৎকার মেয়ে দিদি!

—বয়েস কত?

—এই পনেরো-ষোলো হবে। ধপধপে ফরসা রঙ কি! চেহারা কি!

—তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি? বেল পাকলে কাকের কি? ওরা নিধুর সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে দেবে?

—না, না—তা আমি বলচিনে। তাই কি কখনো দেয়?

—তবে চুপ করে থাক। চেহারা হবে না কেন বল? তোমার মতো আমার মতো পুঁইশাক খেয়ে তো ওরা মানুষ নয়? নির্ভাবনায় দুধ-ঘি খেলে তোমারও চেহারা ভালো হত, আমারও চেহারা ভালো হত।

—সে কথা তো ঠিক দিদি।

—অত বড় পনেরো-ষোলো বছরের ধিঙ্গী মেয়ে যে নিধুর সামনে মা বাপের সামনে হারমোনি বাজিয়ে গান করলে—এতেই দেখ না কেন? তোমার বাড়ির মেয়ে আমার বাড়ির মেয়ে করুক দিকি, কালই গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে এখন। বড়মানুষের ওপর কথা বলে কে? ওরা জানচে আজ এসেচি এগাঁয়ে, কাল যাব চলে হিল্লি-দিল্লি—আমাদের নাগাল পায় কে? তাই বলি ওদের সঙ্গে আমাদের মিশতে যাওয়াই বেকুবি—আমি যাচ্চি দেখাশুনো করচি ভেবে, ওরা ভাবে খোশামোদ করতে আসচে।

শেষের দিকের কথায় বেশ কিছু শ্লেষ মিশাইয়া জগোঠাকরুণ তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন এবং মাজা বাসনের গোছা তুলিয়া লইয়া পুকুরের ঘাট ত্যাগ করিলেন।

সকালে নিধু চলিয়া যাইবে বলিয়া নিধুর মা ভোরে রান্না চড়াইয়াছিলেন। বড় মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর দাদাকে নেয়ে আসতে বল ও পুঁটি—

পুঁটি বলিল—বড়দা এখনও বিছানা থেকে ওঠেনি—

—সে কি রে? ওকে উঠতে বল্। কখন নাইবে, কখন খাবে—বেলা দেখতে-দেখতে হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

নিধুর মা বলিলেন—যাবার সময় একবার ওদের সঙ্গে দেখা করে যা না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কাদের সঙ্গে?

—জজবাবুদের—ওই ওদের—গিন্নির সঙ্গে, মঞ্জুর সঙ্গে?

—হ্যাঁঃ, আমি আবার যাই এখন! কি মনে করবে, ভাববে জলখাবার খেতে এসেচে সকালবেলা।

—তোর যেমন কথা! তা আবার কেউ ভাবে বুঝি? যা না?

—আমার সময় নেই। ক' কোশ রাস্তা যেতে হবে জানো?

মুখে একথা বলিলেও নিধু মনে-মনে ভাবিতেছিল মঞ্জুর সঙ্গে একবার যাওয়ার সময় দেখাটা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু মা বলিলেই তো সেখানে যাওয়া যায় না।

নিধুর মা বলিলেন—সামনের শনিবারে আসবি কিন্তু। আর পুঁটির জন্যে দু-গজ ফিতে কিনে আনিস—রমেশের জন্যে এক দিস্তে কাগজ। ও ভয়ে তোকে বলতে পারে না। আমায় এসে চুপি-চুপি বলচে আমি

বললাম—তুই গিয়ে তোর দাদার কাছে বল না ? বললে—না মা আমার ভয় করে।

নিধু মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া রওনা হইবার পূর্বে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধূলা লইবার চেষ্টায় পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করিতে লাগিল। নিধু শাসনের সুরে বলিল—রমু, চব্বিশখানা ইংরিজি-বাংলা হাতের লেখার কথা যেন মনে থাকে। শনিবারে এসে না দেখলে পিঠের ছাল তুলব।

রমেশ দাদার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বড় লোকের সম্মুখে পড়িলেই যত বিপদ, আড়ালে থাকিলে বহু হাঙ্গামার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

পথে পা দিয়াই নিধু একবার জজবাবুর বাড়ির দিকে চাহিল। এখনো বোধ হয় কেউ ওঠে নাই—বড়লোকের বাড়ি, তাড়াতাড়ি উঠিবার গরজই বা কিসের।

ছায়াভরা পথে শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন নবীন আশা, অপরিচিত অনুভূতি সারা দেহের ও মনের নব পরিবর্তন আনিয়া দেয়। গাছের ডালে বন্য মটরলতা দুলিতেছে, তিৎপল্লার ফুল ফুটিয়াছে—এবার বর্ষায় যেখানে-সেখানে বনকচুর ঝাড়ের বৃদ্ধি অত্যন্ত যেন বেশি। নিধু আশ্চর্য হইয়া ভাবিল—এসব জিনিসের দিকে তাহার মন তো কখনো তেমন যায় না, আজ ওদিকে এত নজর পড়িল কেন ?

শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আছে কাল বিকালে শোনা মঞ্জুর গানের সুর।

সে সুর তাহার সারারাত কানে ঝঙ্কার দিয়াছে—শুধু মঞ্জুর গানের সুর নয়—তাহার সুন্দর ব্যবহার, তাহার মুখের সুন্দর কথা—ঘাড় নাড়িবার বিশেষ ভঙ্গিটি। বড়-বড় কালো চোখের চপল চাহনি।

সত্যই রূপসী মেয়ে মঞ্জু। মহকুমার টাউনে তো কত মেয়ে দেখিল—অমন মুখ এ পর্যন্ত কোনো মেয়েরই সে দেখে নাই জীবনে। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা না হইলে অমন ধারা রূপ যে মেয়েদের হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই—ইহা সে ধারণা করিতে পারিত না।

মঞ্জু স্কুলে পড়ে। স্কুলে-পড়া মেয়ে সে এই প্রথম দেখিল। মেয়েদের এমন নিঃসঙ্কোচ ধরন-ধারণ সে কখনো কল্পনা করিতে পারিত না। এসব গ্রামের অশিক্ষিত কুরূপা মেয়েগুলা এমন অকালপক্ক যে বারো-তেরো বছরের পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতৃব্য সমতুল্য প্রতিবেশীর সামনে দিয়া চলাফেরা করিতে বা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করে।

নিধুর কি ভালোই লাগিয়াছে মেয়েটিকে!

আচ্ছা, অত বড় লোকের মেয়ে সে—তাহার মতো সামান্য অবস্থার লোকের প্রতি অত আদর যত্ন দেখাইল কেন? জীবনে এধরনের ব্যবহার কোনো অনাত্মীয় মেয়ের নিকট হইতে সে কখনো পায় নাই।

মঞ্জুর সহিত আবার যদি দেখা হইত আজ সকালটিতে!

সামনের শনিবারে—তবে একটা কথা। সামনের শনিবারে মঞ্জু নাও থাকিতে পারে। সে স্কুলের ছাত্রী, কতদিন স্কুল কামাই করিয়া এখানে বসিয়া থাকিবে? যদি চলিয়া যায়?

কথাটা ভাবিতে নিধুর যেন রীতিমতো বেদনা বোধ হইতে লাগিল। পরের মেয়ের প্রতি এ ধরনের মনোভাব তাহার এই প্রথম। সারাপথ নেশায় আচ্ছন্নভাবে কাটিয়া গেল নিধুর। সামনে ওই সারি-সারি আড়ত দেখা দিয়াছে—টাউন আর আধমাইল পথ।

নিজের বাসায় পৌছিয়া সে দেখিল বাড়িওয়ালার সরকার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

নিধুকে দেখিয়া বলিল—মোক্তারবাবু, বাড়ি থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ, কালীবাবু কি ভাড়ার জন্যে বসে আছেন ?

—আজ বাবু বললেন মোক্তারবাবুর কাছ থেকে ভাড়াটা নিয়ে আসতে।

—আর দুদিন যাক। বাড়ি থেকে আসচি, হাতে কিছু নেই। বুধবারে আসবেন—

কোর্টে যদু-মোক্তার তাহাকে বলিলেন—ওহে একটা জামিননামায় সই করতে হবে।

—জামিন মুভ্ করলে কে ?

—আমি করলাম। পাচশো টাকার জামিন। যা আদায় করতে পার।

—আপনি বলে দিন। ভালো লোক তো ?

—কপাল ঠুকে জামিন হয়ে যাও। কি ছাড় কেন ?

—তা নয়, আমি বলচি না পালায় শেষকালে। বেশি টাকার জামিন তাই ভয় হয়।

—কোনো ভয় নেই।

নতুন মোক্তার সে, জামিননামার ফি প্রধান সম্বল। যদুবাবু অনুগ্রহ করেন বলিয়া তা মেলে—নতুবা তাহাই কি সুলভ ? এক মাসের মধ্যে একটিবার সে জুনিয়ার হইয়া একটি মোকর্দমায় জামিনের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিল। এ ব্যবসা চলিবে কিনা কে জানে ? বুধবার বাড়িভাড়া দিবে তো বলিল—কিন্তু দিবে কোথা হইতে ?

মোক্তার-বারের ঘরের এক কোণে সাধন-মোক্তার সাক্ষী পড়াইতেছেন, অর্থাৎ যে মিথ্যার তালিম একবার সকালে দিয়া আসিয়াছেন—এখন আবার তাহা সাক্ষীদের মনে আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা লইতেছেন।

সাধনবাবু বলিলেন —এই যে নিধিরাম ! বাড়ি থেকে এলে নাকি ?

নিধু নীরসকণ্ঠে বলিল—এই এখন এলাম। সব ভালো ?

—ভালো আর কই তেমন? বাতে ভুগচি। তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।

—কি বলুন?

—এখন নয়। তিনটের পর ঘর একটু নিরিবিলি হলে তখন বলব। চলে যেও না যেন।

—আচ্ছা, আমি একবার যদুবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। কাজ আছে।

তিনটার পর ব্রিফহীন মোক্তারের দল বড় কেউ বার-লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকে না। থাকেন দু-একজন প্রবীণ ও পসারওয়ালা মোক্তার, তাহাদের কেস থাকে—মক্কেলকে শিখাইতে-পড়াইতে হয়। হাকিমের এজলাসে অকারণেও দু-একবার ঢুকিয়া অনাবশ্যক মিষ্ট কথাও দু-একটা বলিতে হয়।

নিধুর আজ মন তত ভালো ছিল না। সে তিনটার কিছু পূর্বে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া দেখিল—হরিবাবু মোক্তার বসিয়া-বসিয়া ধরণী-মোক্তারের সঙ্গে কোর্টে সেদিন প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে কি করিয়া জেরায় জব্দ করিয়াছেন—তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া যাইতেছেন। ধরণী জুনিয়ার মোক্তার, হরিবাবুর কাছে জামিনটা-আসটার আশা রাখে—সে বেচারী ঘন-ঘন সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িতেছে!

হরিবাবু বলিলেন—আরে নিধিরাম যে! কোর্টে দেখলাম না?

—কোর্টে দেখবেন কি বলুন হরিদা। আমরা হলাম তৃণভোজী জীব—আপনারা বাঘ ভালুক, আপনাদের ছেড়ে আমাদের কাছে কি মক্কেল ঘেঁষে যে হাকিমের এজলাসে সওয়াল-জবাব করতে যাব?

হরিবাবু সহাস্যবদনে বলিলেন—তোমার উপমাটা লাগসই হল না যে! তৃণভোজী জীবের মধ্যে হাতিও যে পড়ে।

—আজ্ঞে তা পড়ে। তবে আমাদের ওজন কম, কাজেই হাতি নই একথা বুঝতে দেরি হয় না। যাঁদের ওজন বেশি, তাঁরা ওটা হবার দাবী করতে পারেন।

—চল হে ধরণী যাওয়া যাক, বলিয়া হরিবাবু উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাধন ভট্টাচার্য ঘরে ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন—কেউ নেই ঘরে? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—তুমি বিয়ে করবে?

নিধু আশ্চর্য হইয়া বলিল—কেন, বলুন তো?

—আমার একটি ভাইঝি আছে—দেখতে-শুনতে—মানে—গেরস্তঘরের উপযুক্ত। রান্নাবান্না—

নিধু বাধা দিয়া বলিল—খুব ভালো পারে বুঝলাম। কিন্তু আমি বিয়ে করে খেতে দোব কি? পসার কি রকম দেখচেন তো?

সাধন ভট্টাচার্য হাসিয়া বলিলেন—ওহে, ওসব কথা ছোকরা মাত্রেই বিয়ের আগে বলে থাকে। আর মোক্তারীর পসার একদিনে হয় না। আমি চব্বিশ বছর এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, আমি সব জানি। তুমি যখন যদুদার মতো মুরুব্বি পেয়েচ, তোমার পসার গড়ে উঠতে দুবছরও লাগবে না। ঢুকেচ তো মোটে একমাস। এখুনি বিগ্ ফাইভদের অন্ন মারবার আশা কর?

—যদুবাবুর ওপর ভরসা করে আমার মতো ব্রিফ্‌লেস্ মোক্তারের বিয়ে করা চলে না।

—খুব চলে। তা ছাড়া আমি তোমায় সাহায্য করব--আমার জামাইকে আমি দেখতে পারব।

ইহাতে নিধু খুব আশান্বিত হইল না, কারণ সাধন-মোক্তারের পসার

এমন কিছু লোভনীয় ধরনের নয়। সে বলিল—না দাদা, ওসব আমাদের সাজে না—আপনিই ভেবে দেখুন না ?

—তোমার সংসারে কে-কে আছেন ?

—বুড়ো বাবা, মা—মানে আমার সৎমা, একটি বৈমাত্র ভাই, আর আমার কটি ভাই-বোন।

— বৈমাত্র ভাইয়ের বয়েস কত ?

বুদ্ধিমান নিধু বুঝিল সাধন-মোক্তার আসলে তাহার সৎমা'র বয়স জানিবার জন্য এই প্রশ্নটি করিয়াছেন সুতরাং সে বলিল—তার বয়েস এই চোদ্দ-পনেরো, তবে আমার সৎমা আমাকে মানুষ করে এসেচেন ছেলেবেলা থেকে। মা'র কথা আমার মনেই পড়ে না।

—তুমি এই রবিবারে আমার বাড়ি খাবে।

—সে তো হয় না। শনিবারে যে বাড়ি যেতে হবে —

—না, না, এই শনিবারে তো গিয়েছিলে। যেতেই হবে—না গেলে শুনব না। এক শনিবার না হয় নাই গেলে বাড়ি ?

নিধিরাম আরও দু-একবার আপত্তি করিল—কিন্তু সাধন-মোক্তার তাহার কথায় আমল দিলেন না। নিধিরাম ভালোমানুষ ও লাজুক, বারের অন্যতম প্রবীণ মোক্তার সাধন ভট্টাচার্যের মুখের উপর জোর করিয়া না বলিতে পারিল না। ঠিক হইয়া গেল নিধিরাম রবিবার সকালে উঠিয়া তাঁহার বাসায় যাইবে, সেখানেই চা খাইবে—তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া চলিয়া আসিবে।

বাসায় আসিয়া নিধিরাম মনমরা হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ আবার কোথা হইতে কি উপসর্গ আসিয়া জুটিল দেখ! কোথায় সে শনিবারের অপেক্ষায় অঙ্গুলে দিন গুণিতেছে, কোথা হইতে বুড়ো সাধন ভট্টচাজ কি বাদ সাধিল!

সে বুঝিতে পারিয়াছে মঞ্জুর সহিত আর তাহার দেখা হইবে না। হয়তো সামনের সোমবারেই সে কলকাতায় তাহার মামারবাড়ি চলিয়া যাইবে। এ শনিবারে গেলে দেখাটা হইত। এবার যদি দেখা না হয়, তবে আবার সেই পূজার ছুটি ছাড়া মঞ্জু নিশ্চয়ই আর বাড়ি আসিবে না। তাহার এখনো তো কতদিন বাকি।

মাথাটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে ভাবিল, মঞ্জুকে এমন করিয়া সে দেখিতে চায় কেন? কেন তাহার মন এত ব্যাকুল সেজন্য? মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করিয়া লাভ কি? আচ্ছা, এবার না হয় সে দেখাই পাইল—কিন্তু জজবাবু যদি আর গ্রামে পাঁচ বছর না আসেন, যদি আদৌ আর না আসেন—তবে মঞ্জুর সঙ্গে দেখাশোনা তো এমনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিসের মিথ্যা মোহে সে রঙিন স্বপ্ন বুনিতেছে?

রবিবারে সাধন-মোক্তার আটটা বাজিতে না বাজিতে নিধুর বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। নিধু বসিয়া-বসিয়া যদু-মোক্তারের বাড়ি হইতে আনা ক্যালকাটা ল' রিপোর্ট পড়িতেছিল। সাধন দেখিয়া বলিলেন—কি পড়ছ হে? বেশ, বেশ। নিজের উন্নতি নিয়েই থাকতে হবে। যদুদার বই? তা ছাড়া আর কে এখানে অত বই কিনবে বল?

নিধু বলিল—বসুন, একটু চা খাবেন না?

—না, না, তুমিই আমাদের বাড়ি গিয়ে চা খাবে—সব ঠিক করে রেখেছে মেয়েরা। ওঠ—

সাধন-মোক্তারের বাড়ি টাউনের পূর্বপ্রান্তে টিকাপাড়ায়। দুজনে হাঁটিয়া আসিলেন, নিধু বাসার চেহারা ও আসবাবপত্র দেখিয়া বুঝিল সাধন-মোক্তারের অবস্থা যে বিশেষ ভালো তাহা নয়। বাহিরের ঘরে একখানা ভাঙা তক্তাপোশের আধ-ময়লা ফরাসের উপর বসিয়া সাধনের মুহুরী কৃপা-

রাম বিশ্বাস লেখাপড়া করিতেছে—একদিকে মক্কেলদের বসিবার নিমিত্ত একখানি কাঠের বেঞ্চি পাতা। একটা পুরোনো আলমারিতে সামান্য দামের টিপকলের তালা লাগানো—ঘরের দোরের বাঁ দিকে তামাক খাইবার সরঞ্জাম, জায়গাটা টিকের গুঁড়ো, তামাকের গুল, আধপোড়া দেশলাই-কাঠি পড়িয়া রীতিমতো নোংরা। দেয়ালে স্থানে-স্থানে পানের পিচের দাগ।

নিধু বাহিরে গিয়া বসিতেই কৃপারাম বিশ্বাস অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—আসুন বাবু, এ শনিবারে বুঝি বাড়ি যাননি? বেশ। বাবু, সোনাতনপুরের মারামারির কেসে কি আপনার কাছে লোক গিয়েছিল?

নিধু বলিল—না, যদুবাবুর কাছে গিয়েচে এক পক্ষ শুনেচি—আমাদের জামিননামা সম্বল, সেটা পাবই। পক্ষ কি আমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের কাছে যায়?

কৃপারাম বিনয়ে গলিয়া গিয়া দুহাত কচলাইয়া বলিতে লাগিল—হেঁ-হেঁ বাবু, ওটা কি কথা—আপনার মতো লোক—ইত্যাদি।

নিধুর মনে হইল কৃপারাম যে তাহাকে অতখানি বিনয় প্রদর্শন করিয়া খাতির করিতেছে—ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার সহিত সাধন-মোক্তারের পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা। নতুবা প্রবীণ সাধন-মোক্তারের মুহুরী ঘুঘু কৃপারাম বিশ্বাসের কথা নয় তাহার প্রতি এতটা হাত কচলাইয়া সম্ভ্রম দেখানো। কই, বার-লাইব্রেরীতে গত দেড় মাসের মধ্যে কৃপারাম কোনোদিন তাহার সঙ্গে দুটি কথাও বলে নাই তো!

সাধন বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন—একটা বালিশ দেবে কি নিধিরাম? কষ্ট হচ্চে বসতে!

নিধিরাম হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, বালিশ কি হবে আমার? আপনি বরং একটা আনান—

এই সময়ে চাকরে একখানা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা, দুটি সন্দেশ এবং এক বাটি চা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিল। সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—জল, জল নিয়ে আয় এক গ্লাস—আর ওরে শোন, পান দুটো অমনি—পান—

নিধু জানাইল সকালবেলা সে পান খায় না। সাধনকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি খাবেন না?

—নাঃ, আমার অম্বল। কিছু সহ্যি হয় না, কাল রাতে খেয়েচি এখনো পেট ভার। তুমি খাও—তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ। আরও লুচি দেবে?

—কি যে বলেন! আর কিছু দিতে হবে না। আর দিলে খাওয়া যায়?

চা পানের পরে এ-গল্পে ও-গল্পে বেলা প্রায় দশটা সাড়ে-দশটা হইয়া গেল। সাধন বলিলেন—তাহলে নিধিরাম এবারে স্নানটা করে নাও এখানেই। ও, নেয়ে এসেচ? তবে আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি।

কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি নিধুকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ক্ষুদ্র বাসা, দু-তিনখানি মাত্র ঘর, কিন্তু বাসায় লোকজন ও ছেলে-মেয়ে নিতান্ত মন্দ নয় সংখ্যায়। নিধু মনে-মনে ভাবিল—বাবা, এ পঙ্গপাল সব থাকে কোথায় এই কটা ঘরে?

বারান্দায় দুখানি কার্পেটের আসন পাতা। একখানিতে নিধুকে বসাইয়া সাধন তাহার পাশের আসনটিতে বসিয়া বলিলেন—ও বুড়ি, নিয়ে এস মা—

একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের না-ফরসা না-কালো রঙের রোগা গড়নের মেয়ে দুজনের সামনে ভাতের থালা নামাইয়া চলিয়া গেল এবং পুনরায় আর একখানা থালার ওপর বাটি সাজাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনের সামনে তরকারির বাটিগুলি স্থাপন করিল। তখন সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সাধন তাহাকে বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে থাকিতে দিলেন না। কখনো

নুন, কখনো লেবু, কখনো জল ইত্যাদি এটা-সেটা আনিবার আদেশ করিয়া সব সময় তাহাকে ঘর-বার করাইতে লাগিলেন। সে এই থাকে এই যায়, আবার আসে সাধনের ডাকে। নিধু মনে-মনে হাসিল, সে ব্যাপারটা আগেই বুঝিয়া লইয়াছে—এই সেই ভাইঝিটি, যাহাকে কৌশল করিয়া দেখাইবার জন্যই আজ এখানে তাহাকে খাওয়াইবার এই আয়োজন। এমন কি নিধুর ইহাও মনে হইল পাশের ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া বাড়ির মেয়েরা তাহাকে দেখিতেছেন। একবার তো একজোড়া কৌতূহলী চোখের সহিত অতি অল্পক্ষণের জন্য তাহার চোখোচোখিই হইয়া গেল।

সাধন বাহিরে আসিয়া বলিলেন—নিধিরাম, আমার সামনে লজ্জা কোরো না, তামাক খাও তো চাকরে দিয়ে যাচ্ছে—কৃপারাম, যাও গিয়ে নেয়ে নাও গে—বেলা হয়েছে অনেক।

নিধিরাম বিড়িটি পর্যন্ত খায় না। সে বলিল—আমি খাইনে, আমি বরং পান আর একটা—

—একটা কেন তুমি চারটা খাও—ওরে ও ইয়ে—আরও পান নিয়ে—সাধন-মোক্তার খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কৃপারাম মুহুরীকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঘরে কেহ নাই—সাধন একটু উসখুস করিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহলে নিধিরাম আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে?

নিধিরাম আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলিল—কৈ, কে বলুন তো?

সাধন-মোক্তার বলিলেন—বেশ, ওই তো তোমাকে পরিবেশন করলে।

—ও! তা—তা বেশ, ভালোই। দিব্যি মেয়েটি।

এটা অবশ্য নিধু বলল নিছক ভদ্রতা ও শোভনতার দিক লক্ষ্য করিয়া কোনো প্রকার বৈবাহিক মনোভাব ইহার মধ্যে আদৌ ছিল না। সাধন

কথা শুনিয়া খুশি হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল নিধুর। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি আপাতত কোনো কথা না উঠাইয়া কয়েকদিন পরে আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নিধু গিয়া দেখিল সাধন-মোক্তার আসামী পড়াইতেছেন। সকালবেলা মক্কেলের ভিড় যাহাকে বলে তাহা না থাকিলেও দু-পাঁচটি মক্কেল গরুর গাড়ি করিয়া দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে।

—বস নিধিরাম, একটু বস। আমি কাজ সেরে নিই—তারপর বল তোমায় মেরেছিল কেন?

যাহাকে শিখানো হইতেছে সে বৃদ্ধা, মারপিটের নালিশ করিতে আসিয়াছে, সঙ্গে দু-তিনটি প্রতিবেশীও আনিয়াছে। বৃদ্ধা শিক্ষা মতো বলিয়া যাইতে লাগিল আমার বাছুর ওনার ধানখেতে গিয়া নেমেছিল, তাই উনি মারামারি করে বাছুরডাকে, আমি তাই দেখে বকি ওনাকে—

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, সব ভুলে মেরে দিলে? তুমি বকবে কেন? তুমি কি বললে?

—আমি দু একটা গালমন্দ দেলাম, বুড়োমানুষ, মুখি এখন তো আর ছুট নেই—

—ওকথা বললে তোমার মোকর্দমা কাৎ হবে—কি শিখিয়ে দিলাম? বলবে, আমি বললাম ওঁকে, তুমি বাছুর মারছ কেন? তোমার ধান খেয়ে থাকে তুমি খোঁয়াড়ে দাওগে যাও—মারো কেন?

বুড়ি বলিল—হুঁ।

সাধন-মোক্তার মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—কি বিপদেই পড়েচি রে? 'হুঁ' কি? কথাটা বলে যাও আমার সঙ্গে-সঙ্গে। তুমি কি বললে বল?

—এই বললাম, তুমি বাছুর মারচ কেন, আমার আজ দুই জোয়ান বেটা

বেঁচে থাকত, তবে কি তুমি আমার বাছুরের গায়ে হাত দিতি—তোমারও যেন একদিন এমনি হয়—

—আহা হা—কোথাকার আপদ রে! জোয়ান বেটার কথায় কি দরকার আছে? জোয়ান বেটা মরুক বাঁচুক কোর্টের তাতে কি? বল আমি বললাম—বাছুর তুমি মারচ কেন, খোঁয়াড়ে দাও যদি অনিষ্ট করে থাকে—

—হুঁ—

—আবার বলে হুঁ! আমি যা বলে দিলাম তা বলে যাও না বাপু, এখানে আমার সময় নষ্ট করবে আর কতক্ষণ, দু-ঘণ্টা তো হয়ে গেল। তারপর যা শিখিয়ে দিলাম, কোর্টে গিয়ে এজাহারের সময় সব ভুলে তাল পাকিয়ে—ভোঁতা মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরে যেও এখন। তুমি ওকথা বলতে সে তোমায় কি বললে?

—বললে—ধান আমার যা লোকসান হয়েচে খোঁয়াড়ে দিলি তা পূরণ হবে না—ওর দাম দিতি—

—ওরে না বাপু না! ও কথা বললে মোকর্দমা সাজানো যাবে না। বলে দিলাম হাজার বার করে যে! কতবার শেখাব এক কথা? বল—আমার কথার উত্তরে সে আমায় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিলে—

—কি বলব বাবু—সে আমায় কি বললে?

—এমন গালাগালি দিলে যা হুজুরের সামনে বলা যায় না। বল?

—এমন গালাগাল দিলে যা হুজুরের সামনে উশ্চারণ করা যায় না—

—হুঁ। বেশ হয়েচে—যাও, এখন কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবে করে ঠিক বেলা এগারোটার সময় কাছারী যাবে। সকালে কাছারীতে না গেলে মোকর্দমা রুজু হবে না।—তারপর হ্যাঁ নিধিরাম, চা খাবে একটু? এই একটু অবসর পেলাম সকাল থেকে।

—আজ্ঞে না চা খাব না। কি বলছিলেন আমায়?

সাধন-মোক্তার কিছু ভূমিকা ফাঁদিয়া পুনরায় ভাইঝির বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন। নিধিরাম বড় লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল—বিবাহের সম্বন্ধে সে এ পর্যন্ত কোনো কথাই ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যেই একথা নাই। কি কুক্ষণেই সাধনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল।

সে বলিল—দেখুন আমি তো এ বিষয়ে কিছু ঠিক করিনি, তা ছাড়া আমার বাবা রয়েচেন—

সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আহা হা, তোমার মত আছে যদি বুঝি তবে তোমার বাবার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমার কথা আগে বল—

নিধু মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তত দুদিন সময় নেওয়া দরকার—তারপর ভাবিয়া একটা ভদ্রতাসঙ্গত উত্তর অন্তত দেওয়া যাইতে পারে। সে বলিল—আচ্ছা কাল শনিবার বাড়ি যাচ্ছি, মা'র কাছে একবার বলে দেখি, সোমবার আপনাকে—

সাধন খপ করিয়া হঠাৎ নিধিরামের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—একাজ করতেই হবে নিধিরাম। আমাদের বাড়িশুদ্ধ সব মেয়েদের তোমাকে দেখে বড্ড পছন্দ হয়েছে। আর ও টাকাকড়ি, পসার-টসারের কথা ছেড়ে দাও। কপালে থাকে হবে, না থাকে না হবে। বলি যদু-দার কি ছিল? ভাঙা থালা সম্বল করে এসেছিলেন এখানকার বারে মোক্তারী করতে। কপাল খুলে গেল, এখন লক্ষ্মী উছলে উঠচে ঘরে! অমনিই হয়। তাহলে সোমবারে যেন পাকা মত পাই—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে না?

শনিবারে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাড়ি যাইবার সময় ছায়াস্নিগ্ধ ভাদ্র অপরাহ্নে সুনীল আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তর দেখিতে-দেখিতে নিধুর মন কিসের আনন্দে ও নেশায় যেন ভরপুর হইয়া উঠিল। মঞ্জুকে আজ সে দেখে নাই দীর্ঘ তেরো দিন—যদি সে থাকে, যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়। কথাটা ভাবিতেই নিধুর বুকের মধ্যে যেন কেমন তোলপাড় করিতে

লাগিল। দেখা হওয়া কি সম্ভব? নাও তো হইতে পারে। মঞ্জু কি আর তাহার জন্য গ্রামে বসিয়া থাকিবে পড়াশুনা ছাড়িয়া?

ভাবিতে-ভাবিতে গ্রামের কাছে সে আসিয়া পড়িল।

আর বেশি দূর নাই। ওই কেঁদেটির বিলের আগাড় দেখা যাইতেছে। নিধু অনুভব করিল তাহার বুকের ভিতরটাতে যেন কেমন এক অশান্ত, চঞ্চল আবেগ, এতদিন এ ধরনের আবেগের অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না।

বাড়ি পৌছিয়াই প্রথমে নিধুর চোখে পড়িল তাহার মা বসিয়া-বসিয়া কচুর ডাঁটা কুটিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই হাসিমুখে বলিলেন—ওই ছাখ এয়েচে! আমি ঠিক বলেচি সে এ শনিবার আসবেই। তাই তো কচুর শাক তুলে বেছে ধুয়ে—ওরে ও পুঁটি, শিগগির তোর দাদাকে হাত পা ধোয়ার জল এনে দে—

হাতমুখ ধুইয়া সুস্থ হইয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিধু মায়ের সহিত গল্প করিতে বসিল। প্রথমে এ কেমন আছে, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বলিল—জজবাবুদের বাড়ি সব ভালো?

নিধুর মা বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—তোকে যে মঞ্জু একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, গেল শনিবারে। তা আমি বলে পাঠালাম সে এ হপ্তাতে আসবে না লিখেচে। এই তো পরশু না কবে আবার জজবাবুর ছেলে এসে জিগগেস করে গেল তুই আসবি কি না।

নিধু বলিল—ও।

—তা একবার যাবি না কি?

—আজ এখন? সন্দে হয়ে গেল যে একেবারে। কাল সকালে বরং—

কথা শেষ না হইতেই বাহিরে মঞ্জুর ছোট ভাই নৃপেনের গলা শোনা গেল—ও নিধুবাবু, এসেচেন নাকি?

নিধু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতেই ছেলেটি বলিল—আপনি এসেছেন? বেশ,

বেশ। আসুন আমাদের বাড়ি, মঞ্জুদিদি ডেকে পাঠিয়েচে। আমায় বললে—দেখে আসতে আপনি এসেচেন কিনা—যদি আসেন তবে ডেকে নিয়ে যেতে বলেচে।

– বীরেন কোথায় ?

—মেজদা কাল কল্‌কাতা চলে গেল।

নিধু ছেলেটির পিছু-পিছু মঞ্জুদের বাড়ি গিয়া বাহিরের ঘর পার হইয়া ভিতরের বাড়ি ঢুকিল। সেদিনকার সেই ঘরের সামনে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল মঞ্জু দাঁড়াইয়া বাড়ির ঝিকে কি বলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মঞ্জুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া বলিল—একি! নিধুদা যে! আসুন আসুন—ও মা—নিধুদা এসেচে—

[illegible]র মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—নিয়ে গিয়ে বসা দালানে—যাচ্চি আমি—

নিধুর বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। সে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুর পিছু-পিছু দালানে গিয়া বসিল।

মঞ্জু কাছেই একটা টুলের উপর বসিয়া বলিল—তারপর ও শনিবারে এলেন না যে!

—বিশেষ কাজ ছিল একটা—

– আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, জানেন ?

—হ্যাঁ শুনলাম।

—কেন জানেন না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, চা খেয়ে নিন আগে তারপর—ও তার মধ্যে আপনি তো চা খান না আবার। জলযোগ করুন বলতে হবে আপনার বেলা। না ?

—যা খুশি বলুন—

—সেদিন যে বলে দিলাম আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করবেন না ? ভুলে গেলেন এরি মধ্যে ?

—আচ্ছা বেশ, এখন থেকে তাই হবে।

—বসুন আপনি, আমি আসচি—

একটু পরে মঞ্জু একটা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া আসিল, নিধুর হাতে দিয়া বলিল—খেয়ে নিন আগে—

নিধু রেকাবির দিকে তাকাইয়া বলিল—এত ?

—ও কিছু না। খান আগে—আমি জল আনি—

জলযোগের পাঠ চুকিয়া গেলে মঞ্জু বলিল—শুনুন। কাল রবিবার বাবার জন্মদিন। বাবা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে চান না, আমরা মাকে ধরেচি বাবার জন্মদিন আমরা করবই। আপনি এসেছেন খুব ভালো হল। আপনি অবিশ্যি আসবেন, জ্যাঠাইমাকেও কাল বলে আসব—আমরা একটা লেখা পড়ব, সেটা একবার আপনি শুনে বলুন কেমন হয়েচে—এই জন্যেই আমি ও-শনিবার থেকে—

নিধু হাসিয়া বলিল—বারে, আমি কি লেখক নাকি ? লেখার আমি কি বুঝি ?

মঞ্জু বলিল—ইস্ ! আমি বুঝি জানিনে—আপনার ভাই রমেশ আপনার একটা খাতা দেখিয়েচে আমাদের—তাতে আপনি কবিতা লিখেচেন দেখলাম যে ! বেশ কবিতা, আমার খুব ভালো লেগেচে—মাও শুনেচেন—

নিধু লজ্জায় ও সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িল। রমেশ বাঁদরটার কি কাণ্ড ! ছেলেমানুষ আর কাকে বলে ! দাদাকে সব দিক হইতে ভালো প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহার মনে যেন আর স্বস্তি নাই। কি দরকার ছিল ইহাদের সে খাতা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইবার ?

নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—সে আবার লেখা! তা—সে সব—রমেশের কথা বাদ—

—কেন সে কিছু অন্যায় করেনি।

—সে সব কবিতা স্কুলে থাকতে লিখতাম—কাঁচা হাতের লেখা—

মঞ্জু প্রতিবাদের সুরে বললে—কেন, আমাদের বেশ ভালো লেগেচে কবিতাগুলো। খুকুকে উদ্দেশ করে যে সিরিজ, ওগুলো সত্যিই চমৎকার! খুকু কে?

নিধু লজ্জিতভাবে বললে—ও আমার ছোট বোন—ওর ডাক নাম নেবু। তিনবছর বয়েস ছিল তখন, এখন বছর আট-নয় বয়েস। দেখোনি তাকে?

—না আমি দেখিনি। এখুনি তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি—আজ দেখতেই হবে। কবির প্রেরণা যে যোগায়, সে বড় ভাগ্যবতী।

—সে তো এখানে নেই। মামারবাড়ি রয়েচে দিদিমার কাছে—দিদিমা বড় ভালোবাসেন কিনা! পুজোর সময় আসবে।

—তবে আর কি হবে! আমাদেরই কপাল। দেখা অদৃষ্টে থাকলে তো!

এই সময়ে মঞ্জুর মা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—নিধু এসেচ বাবা? মঞ্জু তো কেবল তোমার কথা বলচে কদিন তোমার কবিতা পড়ে। ও নাকি কি কাগজ বার করবে, তাতে তোমায় লিখতে হবে।

মঞ্জু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মা সব কথা ফাঁস করে ফেললে তো! আমি সে কথা বুঝি এখনও বলেচি নিধুদাকে! যেমন তোমার কাণ্ড!

নিধু বলিল—কেন, কাকীমা ঠিক বলেচেন। শুনতেই তো পেতাম একটু পরেই—

মঞ্জ হাসিয়া বলিল—একখানা হাতের লেখা কাগজ বের করব ভাবচি, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

মঞ্জুর মা কন্যার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—ও একখানা কাগজ আগেই বের করেছিল, ওঁর সঙ্গে কাজ করেন বি. দাসগুপ্ত নাম শুনেচ তো? সবজজ—খুব পণ্ডিত লোক, তিনি দেখে বলেছিলেন এমন লেখা--

মঞ্জু সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা, মা—

—কেন আমায় বললি, সব কথা ফাঁস করে ফেলি যে! যখন করলাম ফাঁস, তখন ভালো করেই ফাঁস করা ভালো।

মঞ্জু আবদারের সুরে বলিল—মা, নিধুদাকে রাত্তিরে এখানে খেতে বল না? আমরা সব একসঙ্গে—

মঞ্জুর মা বলিলেন—আজ তো খাবার তেমন কিছু ভালো নেই—কি খাওয়াবি নিধুদাকে? তার চেয়ে কাল দুপুরে ওঁর জন্মদিনে পোলাও মাংস হবে, ভালো খাওয়া-দাওয়া আছে, কাল নিধু এখানে তো খাবেই—

—না মা, মাংস দরকার নেই শুভদিনে, তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবাকে আমি বলব এখন—আর আমি বলি শোনো মা। নিধুদা ঘরের ছেলে, আজও খাবে ডাল ভাত—কাল যা খাবে তা তো খাবেই—

তাহাকে লইয়া মাতাপুত্রীর এত কথা হওয়াতে প্রথমটা নিধু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু ইহারা এত সহজ ভাবে সে কথা বলিতেছে যে নিধুর ক্রমশ বোধ হইতে লাগিল যে এই পরিবারের সঙ্গে তাহার বহুদিনের পরিচয়—সত্যই সে যেন তাহাদের ঘরের ছেলেই। এখানে আজ রাত্রে খাইতে কিন্তু নিধুর যে আপত্তি ছিল—তাহা অন্য কারণে। সে বাড়ি ফিরিয়াই বিকালে দেখিয়াছে তাহার জন্য মা বসিয়া-বসিয়া কচুর শাক কুটিতেছেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই সে মা'র রান্না কচুর শাককে উপেক্ষা করিয়া মা'র প্রাণে কষ্ট দিতে পারবে না। কথাটা সে অন্য ভাবে ঘুরাইয়া মঞ্জুকে বলিল।

মঞ্জু ইহা লইয়া বেশি নির্বন্ধাতিশয্য দেখাইল না, নিধু সেজন্য এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নিধু চলিয়া আসিবার সময় মঞ্জু বলিল—কাল সকালে উঠেই এখানে আসবেন কিন্তু। আপনার পরামর্শ নিয়ে আমরা সব সাজাব—অনুষ্ঠান কি রকম হবে না হবে সব তাতেই আপনার সাহায্য না পেলে—

—সে জন্য ভাবনা নেই। আমি আসব এখন—

—শুধু আপনি নন নিধুদা—আপনাদের বাড়িশুদ্ধ সব কাল নেমন্তন্ন। মা বলে দিলেন আপনাকে বলতে—কাল সকালে আমি গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব।

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িতেই নিধুর মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বললে ওরা? কাল ওদের বাড়ি কি রে নিধু, রমেশ বলছিল—

—জজবাবুর জন্মদিন।

—ওমা, ওই বুড়োর আবার জন্মদিন!

—পয়সা থাকলে সব হয় মা—তোমার পয়সা থাকত তোমারও জন্মদিন হত।

—আমার জন্মদিন মাথায় থাকুক বাবা—পয়সার অভাবে তোর, রমেশের, পুঁটুর জন্মদিন কখনো করতে পারিনি। এ দেশে ওর চলনই নেই। থাকবে কি, অবস্থা সব সমান।

নিধু কি সব বলিয়া গেল খানিকক্ষণ ধরিয়া ইহার উত্তরে—কিন্তু নিধুর মা কি যেন ভাবিতেছিলেন—তাঁহার কানে সম্ভবত কোনো কথাই ঢোকে নাই। নিধু কথা শেষ হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—আচ্ছা তোর জন্মদিন কবে মনে আছে তোর? আশ্বিন মাসে তো জানি—কিন্তু তারিখটা—

মায়ের কথা শুনিয়া নিধুর হাসি পাইল। বলিল—কেন মা জন্মদিন করবে নাকি?

—না, তাই বলচি—বলিয়াই নিধুর মা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—জল আছে ঘরে? এক গ্লাস জলে হবে তো রে? আমি যাই?

পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে-আটটার সময় মঞ্জুই তাহার ভাইয়ের সঙ্গে নিধুদের বাড়ি আসিল। নিধুর মা তাহাদের দেখিয়া সসব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসান, কি করেন যেন ভাবিয়া পান না এমন অবস্থা। তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন—এস মা বস। এস বাবা—বড় ভাগ্যি যে তোমরা এলে—

মঞ্জু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না জ্যাঠাইমা। নিধুদা কোথায়?

—সে এইমাত্র যে কোথায় বেরুল—এখুনি আসবে, বস মা।

—আপনারা সবাই পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়ি মা বলে দিলেন। ওখানেই দুপুরে খাবেন সবাই কিন্তু—জ্যাঠাবাবুকে বলবেন।

নিধুর মা চোখমুখ ও কথার ভাবে বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া যেন গলিয়া পড়িলেন।

মঞ্জু খানিক বসিয়া চলিয়া যাইবার সময় বার-বার করিয়া বলিয়া গেল, নিধুদা আসিলেই যেন সে তাহাদের বাড়ি যায়।

বেলা সাড়ে-নটার সময় নিধু মঞ্জুদের বাড়ি গেল। এই সময় হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিনটা যে বিচিত্র অনুষ্ঠান, আমোদ ও পান-ভোজনের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল—নিধু বা তাহাদের বাড়ির কেহই জীবনে ওরকম কিছু কখনো দেখে নাই। মঞ্জুর বিশেষ অনুরোধে নিধু ছোট একটি কবিতাও লিখিয়া দিল মঞ্জুর বাবার জন্মদিন উপলক্ষ্যে। তাহাতে তাঁহাকে ইন্দ্র,

চন্দ্র, বায়ু, বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হইল, যুগপ্রবর্তক ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করা হইল, মহামানব বলা হইল—বলিবার বিশেষ কিছু বাদ রহিল না। মঞ্জু নিজের একটি ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিল, কয়েকটি গান গাহিল, একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। সে যেন এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, সে যেখানে থাকে তাহাই মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে ভরিয়া তোলে—সে যেখানে নাই—তাহা হইয়া উঠে প্রাণহীন—অন্তত নিধুর তাহাই মনে হইল।

মঞ্জুর বাবাকে মঞ্জু নিজের হাতে স্নান করাইয়া শুভ্র গরদ পরাইয়া পিঁড়িতে বসাইল। গলায় নিজের হাতে তৈরি ফুলের মালা দিয়া কপালে নিজের হাতে চন্দন লেপন করিল। তাহার পর যাহা কিছু অনুষ্ঠান হইল, সবই তাঁহাকে ঘিরিয়া।

নিধুর মা এমন ধরনের উৎসব কখনো দেখেন নাই—দেখিয়া-শুনিয়া তাঁহার মুখে কথা সরে না এমন অবস্থা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর নিমন্ত্রিতের দল চলিয়া গেল—নিধুকে কিন্তু মঞ্জু যাইতে দিল না। বৈকালে তাহারা ছোট একটি মূক অভিনয় করিবে, নিধুর বসিয়া এখনই দেখিতে হইবে তাহাদের তালিম দেওয়া। কোথায় কি খুঁত হইতেছে তাহা দেখিবার ভার পড়িল নিধুর উপর।

মঞ্জুর অভিনয় দেখিয়া নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। সুঠাম দেহযষ্টির কি লীলা, হাত-পা নাড়ার কি সুললিত ভঙ্গি, হাসির কি মাধুর্য—সামান্য একটি তক্তপোশ ও দড়ির গায়ে ঝুলানো কয়েকখানি রঙিন শাড়ি ও ফুলের মালার সাহায্যে যে এমন মায়া সৃষ্টি করা যায় দর্শকদের সামনে—তা নিধু এই প্রথম দেখিল। অবশ্য অভিনয়ের সময় নিধুর মা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে নিধু মঞ্জুকে বলিল—যাই তাহলে এখন—

—এখনই কেন?

—সারাদিন তো আছি—

- আরও থাকতে যদি বলি ?
—থাকতে হবে তাহলে—কাল সকালেই তো আবার—
-কাল ছুটি নেই ?
—কিসের ছুটি কাল ?—না।
—সামনের শনিবার আসবেন তো ?
—তা ঠিক বলা যায় না—সব শনিবার তো—
—শুনুন নিধুদা ওসব শুনচিনে। আসতেই হবে শনিবার—আমাদের হাতের লেখা কাগজের ওই দিন একটা উৎসব করব ভাবচি।
—বেশ তাহলে আসব—
—আজ রাত্রে এখানে কেন খেয়ে যান না ?
—দুপুরে ওই বিরাট খাওয়ার পরে রাত্রে কিছু চলবে না, মঞ্জু, ও অনুরোধ কোরো না—
—সে হবে না। মাকে বলি -
—লক্ষীটি ছেলেমানুষি কোরো না—বলি শোনো—
—তাহলে এখন যাবেন না বলুন -
নিধুও বোধহয় মনে-মনে তাহাই চাহিয়াছিল। সে কেবল বলিল—থাকতে পারি, কিন্তু তোমার মুক অভিনয়টি আর একবার দেখাতে হবে—
মঞ্জু উৎসাহের সঙ্গে বলিল—বেশ দেখাব। ভালো লেগেচে আপনার ?
—চমৎকার।
—সত্যি বলচেন নিধুদা ?
—মন থেকে বলচি বিশ্বাস কর -
—তা যখন বললেন—তখন ওর চেয়েও ভালো একটা করি আমি। স্কুলে প্রাইজ পেয়েছিলাম করে—সেটা করব এখন।
—তাহলে রইলাম আমি। না দেখে যাচ্ছিনে—

সন্ধ্যার কিছু পরে 'কচ ও দেবযানী'র মূক অভিনয় মঞ্জু করিল। ছোট ভাইকে কচের ভূমিকায় সহযোগী করিয়াছিল। নিধুর মনে হইল মঞ্জুর ভাই জিনিসটাকে নষ্ট করিল—মঞ্জুর অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইত যদি সে ছোট ভায়ের কাছে বাধার পরিবর্তে সাহায্য পাইত।

অনেক রাত্রে নিধু যখন মঞ্জুদের বাড়ি হইতে ফিরিল—তখন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছে—কিসের নেশা যেন তাহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছে, কত ধরনের চিন্তা ও অনুভূতির জটিল স্রোত তখন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কোনো কিছু ভালোভাবে ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ক্ষমতা নাই তখন।

নিধুর মা বলিলেন—এলি বাবা? কেমন হল বল দিকি? একেই বলে বড়লোক। বড়লোক যে হয়, তাদের সব ভালো না হয়ে পারে না। জন্মদিন যে আবার ওভাবে করা যায়—তা তুমি-আমি জানি?

নিধু হাসিয়া বলিল—জানব কোত্থেকে মা? পয়সা আছে?

—আর কি চমৎকার মঞ্জু মেয়েটা! কেমন পালা গাইলে হাত পা নেড়ে? মুখে কিছু না বললেও সব বোঝা গেল।

—সব বুঝেছিলে মা?

—ওমা, ঠাকুর-দেবতার কথা কেন বুঝব না?

—কোনটা ঠাকুর-দেবতার কথা হল মা? তুমি কিছুই বোঝনি। ও আমাদের ঠাকুর-দেবতার নয় তুমি যা ভাবচ। বুদ্ধ নাম শুনেচ? ও সেই বুদ্ধদেবের—

—তা যাক গে, দেবতা তো, তাহলেই হল। কিন্তু যাই বল, মঞ্জু চমৎকার মেয়ে। না! কি সুন্দর দেখতে?

মঞ্জুর কথায় নিধু বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাইল না। একবার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিধু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করিল। কিসের বেদনা ভালো করিয়া বোঝাও যায় না; অথচ মনে হয় যেন সারা দুনিয়া শূন্য হইয়া গিয়াছে; অন্য কোথাও গেলে কিছু নাই কোথাও। আছে কেবল এখানে মঞ্জুদের বাড়ি।

মঞ্জুদের বাড়ি ছাড়িয়া বিশ্বের কোথাও গিয়া সুখ নাই।

বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া নিধু উদাস মনে পথ চলিতে লাগিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, পথের ধারে ঝোপে বনকলসী ফুটিয়াছে—বাঁশ-ঝাড়ের ও বড়-বড় বিলিতি চটকা গাছের মাথায় সকালের নীল আকাশ, পূজার আর বেশি দেরি নাই, স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে আসন্ন পূজার আভাস যেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলে নিধুর তাহাই মনে হইল।

কৃষকেরা পাট কাটিতে শুরু করিয়াছে, পথের ধারে যেখানে যত খানা ডোবা তাহাতেই পচালো পাটের আঁটি। দুর্গন্ধে এখন হইতেই পথ চলা দায়। নিধু অন্যমনস্কভাবে চলিতে-চলিতে প্রায় নোনাখালির বাঁওড়ের কাছে আসিয়া পড়িল। এখান হইতে টাউন আর মাইল দুই—নিধু বাঁওড়ের ধারে ঘাসের উপর বসিল। আজ এখনো সকাল আছে। তাড়াতাড়ি কোর্টে হাজির হইয়া কি হইবে? মক্কেলের তো বড় ভিড়!

মহকুমা টাউনে তাহার কেহ নাই। একেবারে আত্মীয়স্বজনশূন্য মরুভূমি এটা। জগতে যাহা কিছু সে চায়, তাহার প্রিয়, তাহার কাম্য—পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের গ্রামে। মনের মধ্যে দারুণ শূন্যতা—তা কে পূরণ করিবে? যদু-মোক্তার না তার মুহুরী বিনোদ?

নিধু বুদ্ধিমান লোক, সে কথাটা ভালো করিয়া ভাবিল। মঞ্জুর প্রতি তাহার মনোভাব এমন হওয়ার হেতু কি? মঞ্জু সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু সুন্দরী সে একেবারে দেখে নাই তাহা তো নয়, সেজন্যে সে আকৃষ্ট হয় নাই। তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহার প্রতি মঞ্জুর সদয় ও মধুর ব্যবহার, মঞ্জুর আদর, সৌজন্য—অত বড়লোকের মেয়ে সে, শিক্ষিতা ও রূপসী, তাহার উপর এত দরদ কেন তার?

এ এমন একটা জিনিস—নিধুর জীবনে যাহা আর কখনো ঘটে নাই, একেবারে প্রথম। তাই মঞ্জুর কথা ভাবিলেই, তাহার মুখ মনে করিলেই নিধুর মন মাতিয়া ওঠে—তাহাকে উদাস ও অন্যমনস্ক করিয়া তোলে—সব কিছু তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

অথচ ইহার পরিণাম কি? শুধু কষ্ট ছাড়া?

বুদ্ধিমান নিধু সে কথাও ভাবিয়া দেখিয়াছে।

মঞ্জুকে সে চায় কিন্তু মঞ্জুর বাবা কি কখনো তাহার সহিত মঞ্জুর বিবাহ দিবেন? মঞ্জুকে পাইবার কোনো উপায় নাই তাহার। মঞ্জুকে আশা করা তাহার পক্ষে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার সমান।

কেন এমন হইল তাহার মনের অবস্থা?

অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, মঞ্জুর মনের ভাব কি জানিতে। মঞ্জুও কি তাহাকে এমন করিয়া ভাবিতেছে? একথা কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা শক্ত। কি তাহার আছে, না রূপ, না গুণ, না অর্থ—মঞ্জু তাহার কথা কেন ভাবিবে? সে গরিবের ছেলে, মোক্তারী করিতে আসিয়া পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিয়া নিজে দুটি রাঁধিয়া খাইয়া মক্কেল শিখাইয়া, যদু-মোক্তারের দয়ায় জামিননামা সই করিয়া গড়ে মাসে আঠারো-উনিশ টাকা রোজগার করে—কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে তাহার মতো লোকের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারে—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত।

নিধু বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল বিনোদ-মুহুরী তাহার অপেক্ষায় বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনোদ-মুহুরী বলিল—বাবু এলেন ? বড্ড দেরি করে ফেললেন যে!

—কেন বল তো ?

—দুটো মক্কেল এসেচে—চুরির কেস। আমি ধরে রেখে দিয়েচি কত চালাকি খেলে। তারা হরিহর নন্দীর কাছে কি মোজাহর হোসেনের কাছে যাবেই। আজই এজাহার করাতে হবে—বলেচি বাবু আসচেন, বস - এই এলেন বলে। ধরে কি রাখা যায় ?

—আসামী না ফরিয়াদী—

—ফরিয়াদী, বাবু। আসামী গিয়েচে যদুবাবুর কাছে। এদের অনেক করে ধরে রেখেচি, বাবু। খেতে গিয়েচে হোটেলে।

নিধু নির্বোধ নয়, বিনোদ-মুহুরীর চালাকি বুঝিতে পারিল। বিনোদ-মুহুরী টাউট্গিরি করিয়া কিছু কমিশন আদায় করিবে, এই তাহার আসল উদ্দেশ্য। নতুবা আসামী পক্ষ যখনই যদু-মোক্তারের কাছে গিয়াছে, অপরপক্ষ নিধুর কাছে আসিবেই—তাহাই আসিতেছে আজ দুমাস ধরিয়া। বিনোদের টাউট্গিরি না করিলেও তাহারা এখানে আসিত। বিনোদের খোশামোদ করা ইত্যাদি সব বাজে কথা।

নিধু বলিল—টাকার কথা কিছু বলেছিলে ?

বিনোদ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—না বাবু, আপনি এসে যা বলবেন ওদের বলুন - আমি টাকার কথা বলবার কে ?

—আচ্ছা, আমি কোর্টে চললাম। তুমি ওদের নিয়ে এস—

—বাবু, ওদের এজাহারটা একটু শিখিয়ে নেবেন কখন ?

—কোর্টেই নিয়ে এস যা হয় হবে।

বার-লাইব্রেরীতে ঢুকিতেই প্রথমে সাধন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। সাধন

তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আরে এই যে! আমি ভাবচি, আজ কি আর এলে না?—দেরি হচ্চে যখন, তখন বোধ হয়—শরীর বেশ ভালো? বাড়ির সব ভালো?

তাহার স্বাস্থ্য ও তাহার পরিবারের কুশল সম্বন্ধে সাধন-মোক্তারের এ অকারণ ঔৎসুক্য নিধুকে বিরক্ত করিয়াই তুলিল। সে বিরস মুখে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, সব মন্দ নয়।

সাধন ভট্‌চাজ বলিলেন—ভালো কথা, একটা জামিননামায় সই করতে হবে তোমায়। মক্কেল পাঠিয়ে দেব এখন—

নিধু ইহার ভিতর সাধন ভট্‌চাজের স্বার্থসিদ্ধির গন্ধ পাইয়া আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—কিন্তু বিরক্ত হইলে ব্যবসা চলে না—অন্তত একটা টাকা তো ফি পাওয়া যাইবে জামিননামায় সুতরাং সে বিনীতভাবে বলিল—দেবেন পাঠিয়ে।

—আজ একবার নতুন সাবডেপুটির কোর্টে তোমায় নিয়ে যাই চল—আলাপ হয়নি বুঝি?

—না, উনি তো শুক্রবারে এসেচেন, সেদিন আমার কেস ছিল না, ওঁকে চক্ষেও দেখিনি—

—হাকিমদের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো। চল যাই—

নবাগত সবডেপুটির নাম সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স বেশি নয়। লম্বা ধরনের গড়ন, চোখে চশমা, গায়ের রঙ বেশ ফরসা। এজলাসে কোনো কাজ ছিল না, সুনীলবাবু একা বসিয়া নথির পাতা উল্টাইতেছিলেন, সাধন ভট্‌চাজ ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে বলিলেন—হুজুরের এজলাস যে আজ ফাঁকা

—আসুন সাধনবাবু, আসুন। এ মহকুমায় দেখচি কেস বড় কম—ভাবচি দাবা খেলা শিখব না ছবি আঁকা শিখব—সময় কাটা তো চাই? ইনি কে?

—হুজুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে নিয়ে এলাম, এঁর নাম নিধিরাম রায় চৌধুরী—মোক্তার। এই সবে মাস দুই হল—

—বেশ, বেশ। বসুন নিধিরামবাবু, কেস নেই, বসে একটু গল্পগুজব করা যাক—

নিধিরাম নমস্কার করিয়া বসিল। এজলাসে হাকিমদের সামনে বসিতে এখনো যেন তাহার ভয়-ভয় করে। কথা বলিতে তো পারেই না।

সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবুর বাড়ি কি এই সবডিভিসনেই?

নিধিরাম গলা ঝাড়িয়া লইয়া সসম্ভ্রমে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—এখান থেকে ছ ক্রোশ, কুড়ুলগাছি—

সুনীলবাবু চোখ কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া কথা মনে অনিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—কুড়ুলগাছি? কুড়ুলগাছি? আচ্ছা, আপনাদের গ্রামেই কি লালবিহারীবাবুর বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বুঝি আজকাল কণ্টাইয়ের মুন্সেফ—না?

—কণ্টাই থেকে বদলি হয়েছেন মেদিনীপুর সদরে। দেশে এসেছেন তিন মাসের ছুটি নিয়ে—

—ছুটিতে আছেন? কেন অসুখবিসুখ নাকি?

—না শরীর বেশ ভালোই। বাড়িতে এবার পুজো করবেন শুনচি—আর বোধহয় বাড়িঘর সারাবেন—

—তাই নাকি? বেশ, বেশ। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব কিনা। কলকাতায় আমাদের বাড়ির পাশেই ওঁর শ্বশুরবাড়ি। সিমলে ষ্ট্রীটে—আমাদের সঙ্গে খুব জানাশোনা—ওঁরা ভালো আছেন সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—ভালোই দেখে এসেছি।

—আমার নাম করবেন তো লালবিহারীবাবুর কাছে।

—নিশ্চয়ই করব—এ শনিবারে গিয়েই করব—

—বলবেন একবার সময় পেলে আমি যাব—কি গাঁয়ের নামটা বললেন? কুড়ুলগাছি—হ্যাঁ, কুড়ুলগাছিতে।

—সে তো আমাদের সৌভাগ্য, হুজুরের মতো লোক যাবেন আমাদের গ্রামে।

নিধুর বিনয়ে সুনীলবাবু পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল তাঁহার মুখ দেখিয়া। নিধুর দিকে তাকাইয়া খুশির সুরে বলিলেন—আজ আসবেন আমার ওখানে? আসুন না—একটু চা খাবেন বিকেলে? সাধনবাবু আপনিও আসুন না?

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল হাকিমের শিষ্টতায় ও সৌজন্যে। সাধনবাবুর তো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি বিনয়ে ও সম্ভ্রমে বিগলিত হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে নিশ্চয়ই যাব হুজুর যখন বলছেন—নিশ্চয়ই যাব—

—হ্যাঁ আসুন—এই ধরুন—ছ-টার সময়—

এই সময় হরিবাবু মোক্তার দুজন মক্কেল লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হুজুর, কি ব্যস্ত আছেন? একটা এজাহার করতে হবে আমার মক্কেলের—

নিধু ও সাধন ভট্টচাজ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলে সবডেপুটি বাবু বলিলেন—তা হলে মনে থাকে যেন নিধুবাবু—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বাহিরে আসিয়া সাধন ভট্টচাজ বলিলেন—সব হুজুরের সঙ্গে আমার খাতির বুঝলে? তোমায় সব এজলাসে একে-একে নিয়ে যাব। তবে কি জানো—এস. ডি. ও. আর সবডেপুটি—এঁদের নিয়েই আমাদের কারবার। দেওয়ানী কোর্টে আমাদের তত যেতে তো হয় না, ফৌজদারী হাকিমদের সঙ্গে ভাব রাখলেই চলে যায়—

বার-লাইব্রেরীতে আসিবার পূর্বে সাধন ভট্চাজ নিম্ন স্বরে বলিলেন —ভালো কথা, আমার সেই প্রস্তাবটার কি হল হে ?

নিধুর গা জ্বলিয়া গেল। সে এতক্ষণ ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। ইতস্তত করিয়া বলিল—এখনো তো ভেবে দেখিনি—

—বাড়িতে কিছু বলনি ?

—আজ্ঞে না—

—তোমার মেয়ে পছন্দ হয়েচে কি না বলো · আসল কথা যেটা।

নিধু ভদ্রতার খাতিরে বলিল—আজ্ঞে না, মেয়ে ভালোই।

—তোমার সঙ্গে সামনের শনিবারে তোমাদের বাড়ি যাই না কেন ?

—আপনি যাবেন আমার বাড়িতে সে তো ভাগ্যের কথা। তবে আমি বলচি কি এ শনিবারে না হয় আমি একবার জিগগেস করেই আসি বাবাকে—

—খুব ভালো। তাই কোরো। সোমবারে যেন আমি নিশ্চয়ই জানতে পারি—

বিকালে সুনীলবাবুর বাসায় নিধু গিয়া দেখিল সাধন ভট্চাজ পূর্ব হইতেই সেখানে বসিয়া আছেন। সুনীলবাবু তখনো কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফেরেন নাই। চাকরে তাহাকে অভ্যর্থনা করাইয়া বসাইল।

সাধন বলিলেন—এস. ডি ও. নেই কিনা· সুনীলবাবু ট্রেজারীর কাজ শেষ করে আসবেন বোধহয়।

আরও ঘণ্টাখানেক বসিবার পরে সুনীলবাবুকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিতে দেখা গেল।

উহাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—বড্ড দেরি হয়ে গেল—সো সরি ! আজ আবার বড় কর্তা নেই—টুরে বেরিয়েচেন মফস্বলে—ট্রেজারির কাজ দেখে আসতে হল কিনা। বসুন—আসচি—

বাইরের ঘরটিতে দুখানা বেতের কৌচ, দুখানা টেবিল, খান চার-পাঁচ চেয়ার পাতা। একটা ছোট আলমারিতে অনেকগুলি বাংলা ও ইংরাজি বই—দেওয়ালে কয়েকখানি ফটো, কয়েকখানি ছবি। তাহার মধ্যে একখানি ছবি নিধুর বেশ ভালো লাগিল। একটা গাছের তলায় দুটি হরিণ ক্রীড়ারত—দূরে কোনো স্রোতস্বিনী, অপরপারে কাননভূমি, আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারিতেছে।

সে সাধন ভট্‌চাজকে ছবিখানি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কি চমৎকার না ?

সাধন ভট্‌চাজ মোক্তারী করিয়া ও মক্কেল শিখাইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন জিনিস দেখিতে ভালো, কোনটা মন্দ, ইহা লইয়া কখনো মাথা ঘামান নাই। সুতরাং তিনি অনাসক্ত ও উদাসীন দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কোনটি ? ও-খানা ? হ্যাঁ, অ বেশ।

এমন সময় সুনীলবাবু একটা সিগারেটের টিন লইয়া ঘরে ঢুকিয়া নিধুর সামনের টেবিলে টিনটি রাখিয়া বলিলেন—খান—

নিধু তো এমনি কখনো ধূমপান করে না, সাধন ভট্‌চাজ করেন বটে কিন্তু হাকিমের সামনে কি করিয়া সিগারেট টানিবেন ? সে ভরসা তাঁহার হয় না। সুতরাং যেখানকার সিগারেটেব টিন, সেখানেই পড়িয়া রহিল। সাধন ভট্‌চাজ কৃত্রিম খুশির ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন—চমৎকার ছবিগুলো আপনার ঘরে—

সুনীলবাবু বলিলেন—এখানে ভালো ছবি কিছু আনিনি। হয়েচে কি, ভালো ছবি কিনবার রেওয়াজ আমাদের বাঙালীর মধ্যে নেই বললেই হয়। আমরা ছবির ভালোমন্দ প্রায়ই বুঝিনে। অনেক সময় নিকৃষ্ট বিলিতি ওলিওগ্রাফ কিনে এনে বৈঠকখানায় জাঁক করে বাঁধিয়ে রাখি—সাধনবাবু

যেখানা দেখালেন, ওখানা সত্যিই ভালো ছবি। নন্দলাল বসুর আঁকা একখানা ছবির প্রিণ্ট। নন্দলাল বসুর নাম নিশ্চয়ই—

কে নন্দলাল বসু, সাধন ভট্টচাজ জীবনে কখনো শোনেননি, হাকিম খুশি করিবার জন্য সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব—খুব—

—আমাদের বাড়ির মা-বাবা সবাই নন্দলাল বসুর ছবির ভক্ত—

—আজ্ঞে তা হবেই তো! কত বড় শিক্ষিত বংশ আপনাদের—

নিধু আলমারির বই দেখিতেছে দেখিয়া সুনীলবাবু বলিলেন—বই প্রায় সব এখানে পাবেন, আজকাল যা-যা বেরুচ্চে—বই পড়তে ভালোবাসেন দেখচি আপনি—

নিধু বলিল—বই ভালোবাসি, কিন্তু এসব জায়গায় ভালো বই মেলেই না।

—কেন আপনাদের বার-লাইব্রেরীতে?

—মোক্তার বারে দু-দশখানা বাঁধানো ল' রিপোর্ট আর উইক্‌লি নোটস্‌ ছাড়া আর তো বই দেখিনে।

—আপনি আমার কাছ থেকে বই নিয়ে যাবেন, আবার পড়া হলে ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে যাবেন।

—তাহলে তো বেঁচে যাই—

—আচ্ছা, কুড়ুলগাছি এখান থেকে ক-মাইল হবে বললেন?

—ছ-ক্রোশ রাস্তা হবে—

—যাবার কি উপায় আছে?

—গরুরগাড়ি করে যাওয়া যায়—নয় তো হেঁটে—

—সাইকেলে যাওয়া যায় তো? আমাকে নিয়ে যাবেন?

—সে তো আমাদের ভাগ্য, কবে যাবেন বলুন?

—লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির খুব জানাশুনো—আমি এখানে নতুন এসেচি, উনি জানেন না, জানলে এতদিন ডেকে নিয়ে যেতেন।

—বেশ, বেশ। আমি গিয়ে বলব এ শনিবারেই।

এই সময় ভৃত্য চা ও খাবার আনিয়া সামনের টেবিলে রাখিয়া দিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আসুন, চা খেয়ে নিন—চাকরে-বাকরে যা করে, তেমন কিছু ভালো হয়নি। বাসায় আমি একা, মেয়েমানুষ কেউ নেই তো।

সাধন ভট্‌চাজ সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর কি আপাতত এখানে একা আছেন?

—একাই থাকি বই কি।

—কেন আপনার স্ত্রীকে বুঝি নিয়ে আসেননি?

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! স্ত্রী কোথায়? এখনো বিয়ে করিনি—

সাধন ভট্‌চাজ অপ্রতিভের সুরে বলিলেন—ও, তা তো বুঝতে পারিনি। তা হুজুরের আর বয়েস কি? আপনি তো ছেলেমানুষ—করে ফেলুন এইবার বিয়ে। এই আমাদের এখানে থাকতে-থাকতেই—

—ভালোই তো। দিন না একটা যোগাড় করে—

সাধন ভট্‌চাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—যোগাড় করার ভাবনা? হুজুরের মুখ থেকে কথা বেরুলে একটা ছেড়ে দশটা পাত্রী কালই যোগাড় করে দেব।

—নিধিরামবাবু আপনি বিবাহিত?

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আজ্ঞে না, এখনো করিনি—

—আপনি তো আমার চেয়েও বয়সে ছোট—আপনার যথেষ্ট সময় আছে এখনো।

সাধন ভট্‌চাজ ব্যগ্রভাবে নিধুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

—আর হুজুরেরই কি সময় গিয়েচে নাকি! বলুন তো দেখি চেষ্টা কাল থেকেই—

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—হবে, হবে, ঠিক সময়ে বলব বইকি।

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া চা-মজলিস শেষ হইলে উভয়ে সুনীল-বাবুর বাসা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে সাধন ভট্টচাজকে একটু অন্যমনস্ক মনে হইল। নিধুর কথার উপরে সাধন দু-একটা অসংলগ্ন উত্তর দিলেন। নিধুর বাসার কাছে আসিয়া সাধন একবার মাত্র বলিলেন —তাহলে নিধু তুমি এ শনিবার বাড়ি যাচ্ছ নাকি?

নিধু বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ - যাব বই কি—

—আচ্ছা তা হলে সোমবার দেখা হবে। আসি আজ—

নিধু মনে-মনে হাসিল। সাধন-মোক্তারকে সে ইতিমধ্যে বেশ চিনিয়া ফেলিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া তিনি এক পাও চলেন না। আশ্চর্য! ওই মেয়েকে সাবডেপুটি সুনীলবাবুর হাতে গছাইবার দুরাশা সাধনের মনে স্থান পাইল কি করিয়া? যাক পরের কথায় থাকিবার তাহার দরকার নাই। সে নিজে আপাতত সাধন-মোক্তারের তাগিদের দায় হইতে রেহাই পাইয়াছে - ইহাই যথেষ্ট।

ভাদ্রমাসের দিন ছোট হইয়া আসিতেছে ক্রমশ--নিধুর সকল ব্যস্ততাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামারগাছির দীঘির পাড়ে আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ি পৌঁছিল সে সন্ধ্যার প্রায় আধঘণ্টা পরে। আজ মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনো উপায় নাই। এত রাত্রে সে কোন ছুতায় মঞ্জুদের বাড়ি যাইবে ?

বাড়িতে সে পা দিতেই তাহার মা বলিলেন—তুই এলি ? জজবাবুর ছেলে তোকে বিকেল থেকে তিনবার খোঁজ করে গিয়েচে। এই তো খানিক আগেও এসেছিল—বলে গিয়েচে এলেই পাঠিয়ে দিতে- মঞ্জু কি দরকারে তোর খোঁজ করেচে—

নিধু উদাসীন ভাবে বলিল—ও ! আচ্ছা দেখি—আবার রাত হয়ে গেল এদিকে—

—রাত তাই কি ! মঞ্জুর ভাই বলে গেল, যত রাত হয় জ্যাঠাইমা, নিধুদা এলে পাঠিয়ে দেবেনই—

—বেশ যাব এখন। হাত মুখ ধুই—

ঘরে ছোট্ট একখানা আর্শি ছিল। নিজের মুখ তাহাতে দেখিয়া নিধু বিশেষ খুশি হইল না। পথশ্রমে ও ধূলায় মুখের চেহারা - নাঃ, হোপলেস্! ভদ্রমহিলাদের সামনে এ চেহারা লইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব।

কিছুক্ষণ পরে নিধুর মা ছেলেকে গামছা কাঁধে ভিজা কাপড়ে পুকুরের ঘাট হইতে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—হ্যাঁরে, ওকি, তুই নেয়ে এলি নাকি এই সন্দেবেলা ?

—হ্যাঁ মা, বড্ড ধুলো আর গরম—তাই নেয়ে সাবান দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলাম—

--অসুখ-বিসুক না করলে বাঁচি এখন! কক্ষনো তো সন্দেবেলা নাইতে দেখিনে তোকে—কাপড় ছেড়ে এসে জল খেয়ে নে। চা খাবি ?

নিধু জানে মা চা করিতে জানে না। তাছাড়া ভালো চা বাড়িতে নাইও, কারণ তাহাদের বাড়িতে কথনো কালে ভদ্রে কেহ শথ করিয়া হয়তো চা খায়—তাহাও ঔষধ হিসাবে ; সর্দি-টর্দি লাগিলে তবে।

সে বলল—না মা চা থাক—তুমি খাবার দাও বরং—

নিধুর মা ছেলেকে রেকাবিতে করিয়া তালের ফুলুরি ও গুড় আনিয়া দিলেন। নিধু খাইতে ভালোবাসে বলিয়া দ্বিপ্রহরের রন্ধন সারিয়া এগুলি নিজ হস্তে করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলেন—খা তুই—আর লাগে আরও দেব, আছে।

এমন এক সময় আসে জীবনে, আসল মাতৃস্নেহও মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না, বরং উত্যক্ত করিয়া তোলে। নিধুর জীবনে সেই সময় সমাগত। সে এতগুলি তেলে-ভাজা তালের বড়া এখন বসিয়া-বসিয়া খাইতে রাজী নয়। তাহাতে প্রথমত তো সময় যাইবে, তারপর যদি মঞ্জুরা জলখাবার খাইবার জন্য বলে—কিছুই খাওয়া যাইবে না।

গোগ্রাসে কতক বড়া খাইয়া কতক বা ফেলিয়া নিধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মুখ ধুইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

নিধুর মা ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁরে, ওমা একি করে খেলি তুই ? সবই যে ফেলে গেলি ? ভালোবাসিস বলে বসে-বসে করলাম, তা পান খাবি নে ?

উত্তরে দরজার বাহির হইতে নিধু কি যে বলিল—ভালো বোঝা গেল না।

মঞ্জুদের বাড়ির বাহির দরজাতে পা দিতেই নৃপেনের সঙ্গে দেখা।

—ও দিদি, নিধুদা এসেচে—এই যে--ওমা—বলিতে-বলিতে সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতেই বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল।

মঞ্জু হাসিমুখে ঘর হইতে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এই যে আসুন নিধুদা, আমি আজ তিনবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি আপনার খোঁজে। এই মাত্তর বলছিলাম ওকে আর একবার গিয়ে দেখে আসতে এলেন কিনা। কতক্ষণ এসেচেন?

—এই ঘণ্টাখানেক। সন্দের পর এসেচি—এসে নেয়ে এলাম পুকুরে—

—আসুন বসুন। কিছু মুখে দিন—

—সব সেরে এসেচি বাড়ি থেকে—

এটাও তো বাড়ি নিধুদা। সেরে এসেচেন বলে কি রেহাই পাবেন? বসুন—

মঞ্জুকে নিধুর আজ বড় ভালো লাগিল। সে একখানা ফিকে ধূসর রঙের জরির কাজ করা ঢাকাই শাড়ি ও ঘন বেগুনি রঙের সাটিনের ব্লাউজ পরিয়াছে, পিঠে লম্বা চুলের বিনুনির অগ্রভাগে বড়-বড় ট্যাসেল দোলানো, খালি পায়ে আলতা, সুন্দর ফরসা মুখে ঈষৎ পাউডারের আমেজ--বড় বড় চোখে প্রসন্ন বন্ধুত্বের হাসি।

নৃপেন বলিল—কাল আপনি আছেন তো? আমাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা জানেন না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় কে করবে—

—বাবা এখানকার পাঠশালার ছেলেদের আর মেয়েদের মেডেল দিচ্চেন। অবিশ্যি যে ফার্স্ট হবে তাকে দেবেন। বাবা সভাপতি, স্কুল সবইনস্পেক্টার বিচার করবেন। বাবা মেডেল দেবেন, বাবা তো বিচার করতে পারেন না?

—কাল কখন হবে?

—এই বেলা দুটো থেকে আরম্ভ হবে, আমাদের বাড়ির বৈঠকখানাতেই হবে। বেশি তো ছেলে নয়, ত্রিশ না বত্রিশটি ছেলেতে মেয়েতে—

এই সময় মঞ্জু খাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিল—অমনি সব ফাঁস করে দেওয়া হচ্চে! কোথায় আমি ভাবচি খাবার খাইয়ে সুস্থ করে নিধুদাকে সব বলব—না উনি অমনি—

নৃপেন অভিমানের সুরে বলিল—বাঃ, তুমি কি আমায় বারণ করে দিয়েছিলে? তাছাড়া আসল কথাটা তো এখনো বলিনি, সেটা তুমিই বল।

নিধু মঞ্জুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—অন্য কিছু নয়, আপনাকেও একজন জজ হতে হবে, বাবাকে আমি বলেচি বিশেষ করে। আপনাকে নিতেই হবে। কেমন রাজী?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—তুমি কি যে বল মঞ্জু! আমি ভালো আবৃত্তি করেচি কোনো কালে যে জজ হতে যাব! সব বাজে।

—ওসব বললে আমি শুনচিনে—হতেই হবে আপনাকে!

—কি রকম কি করতে হবে তাই জানিনে!

—সব বলে দেব তা হলেই হল তো?

মঞ্জুদের বাড়ি আসিলেই তাহার ভালো লাগে। সপ্তাহের সমস্ত পরিশ্রম, মক্তু-মোক্তারের পেছনে-পেছনে জামিননামার উমেদারী করা, মক্কেলদের মিথ্যে কথা শেখানো—সব শ্রমের সার্থকতা হয় এখানে। সারা সপ্তাহের দুঃখ, একঘেয়েমি কাটিয়া যায় যেন। ইহাদের বাড়িতে সব সময় যেন একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছে—যে আনন্দের স্বাদ সে সারাজীবনে কোনোদিন পায় নাই—এখানে আসিয়াই তাহার প্রথম সন্ধান সে পাইল। কিন্তু মঞ্জু আছে বলিয়াই এই বাড়িটি সজীব হইয়া আছে, মঞ্জু যেন ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

নিধু বলিল—কি কবিতা আবৃত্তি হবে শুনি?

—রবীন্দ্রনাথে 'দুইবিঘা জমি' আর মাইকেল মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'—

—আমি নিজে কখনোই ও দুটো ভালো করে আবৃত্তি করতে পারিনে—

—তাহলেই তো আপনি সব চেয়ে ভালো জজ হতে পারবেন—

—আমি কেন তবে? আমাদের গাঁয়ের হরি কলুকে জজ কর না কেন তবে?

মঞ্জু হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিধুর মনে হয় এমন বীণার ঝঙ্কারের মতো সুমিষ্ট হাসি সে কখনো শোনে নাই।

নৃপেন বলিল—নিধুদা, দিদিকে একবার বলুন না ও দুটো আবৃত্তি করতে—

নিধু বলিল—কর না মঞ্জু, কখনো শুনিনি তোমার মুখে—

মঞ্জুর একটা গুণ, বেশিক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কোনো বিষয়ের জন্যই সাধিতে হয় না—যদি তাহার অভ্যাস থাকে, সেটা সে তখনি করে। মঞ্জুর চরিত্রের এ দিকটা নিধুর সব চেয়ে ভালো লাগে—এমন সপ্রতিভ মেয়ে সে কখনো দেখে নাই।

মঞ্জু দুটি কবিতাই আবৃত্তি করিল। নিধু মুগ্ধ হইয়া শুনিল—এমন গলার সুর, এমন হাত নাড়িবার সুকুমার ভঙ্গি এসব পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে কল্পনা করাও কঠিন।

মঞ্জু বলিল—নিধুদা, আমরা একটা অভিনয় করব সেদিন বলেছিলুম—থাকবেন আপনি?

—নিশ্চয়ই থাকব—

—কি বই প্লে করা যায় বলুন না?

—আমি কি বইয়ের কথা বলব বল? আমি কখনো কিছু দেখিনি—

নিধুর এই সরলতা মঞ্জুর বড় ভালো লাগে। চাল-দেওয়া ছোকরা সে

তাহার মামারবাড়ির আশে-পাশে অনেক দেখিল, কিন্তু নিধুদার মধ্যে বাজে চাল এতটুকু নাই, মঞ্জু ভাবে।

নৃপেন বলিল—রবীন্দ্রনাথের একটা বই করা যাক—ধর 'মুক্তধারা'—

মঞ্জু বলিল—বড় শক্ত হবে—সে আমাদের স্কুলে মেয়েরা করেছিল সেবার, অনেক লোক দরকার- বড্ড শক্ত। নিধুদা একটা লিখুন—

নিধু এ ধরনের কথায় বড় লজ্জা পায়। তাহাকে ইহারা ভাবিয়াছে কি? কোন কালে সে বাংলা লিখিল?

সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—আমাকে কেন মিথ্যে বলা? আমি লিখতে জানি?

মঞ্জু বলিল—আপনার কবিতা তো দেখেচি- দেখিনি?

—সে ঝোঁকের মাথায় লেখা বাজে কবিতা—তাকে লেখা বলে না।

—তাই আমাদের লিখে দিন, সেই বাজে বই-ই আমরা প্লে করব।

—তার চেয়ে তুমি কেন লেখ না মঞ্জু?

—আমি! তাহলেই হয়েচে! আমি এইবার কলম ধরে অনুরূপা দেবী হব আর কি!

—ভালো কথা, মঞ্জু, আমি বই পড়তে পাইনে—আমায় খানদুই বই দিয়ো—এবার যাবার সময় নিয়ে যাব।

—এতদিন বলেননি কেন? বই অনেক আছে। দিয়ে দিতাম—যখন যা দরকার হবে নিয়ে যাবেন।

—কি-কি বই আছে?

—অনেক, অনেক—কত নাম করব? রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ বারো ভল্যুম আছে—মাইকেল আছে—

—কবিতা নয়, উপন্যাস আছে?

—তাও আছে। মা'র কাছ থেকে চাবি আনব? দেখবেন?

—না এখন থাক, রাত হয়ে গিয়েচে। কাল সকালে আসব—

—আচ্ছা, নিধুদা আপনি কেন ছুটি নিন না দিন কতক ?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বল তো ?

—আপনি থাকলে বেশ লাগে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে মিশবার লোক নেই আর কেউ। আপনি আসেন তবু দুদিন বেশ আনন্দে কাটে।

—আমার আবার ছুটি কি ? আমি তো কারো চাকুরি করি না ?

—তবে ভালোই তো। এ হপ্তায় আর যাবেন না—কেমন ?

—না গেলে পসার নষ্ট হয়ে যাবে যে ! নতুন প্র্যাকটিসে বসে কামাই কর' চলে না।

সেদিন রাত্রে বাড়ি আসিয়া নিধুর আর ঘুমই হয় না।

মঞ্জু তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সে থাকিলে নাকি মঞ্জুর ভালো লাগে—মঞ্জুর মুখে এ কথা সে কোনোদিন শুনিবে ইহা বহুদূর নীল সমুদ্রের পারে স্বর্ণদ্বীপের মতো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। তবুও সে নিজের কানে শুনিয়াছে মঞ্জুই একথা বলিয়াছে। ভোরে উঠিয়া সে বাড়িতে থাকিতে পারিল না। গ্রামের পথে-পথে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া পুকুরে স্নান করিয়া আসিল।

নিধুর মা বলিলেন—না খেয়ে বেরিও না যেন—

—মা, ধোপার-বাড়ি থেকে কাপড় এসেচে ?

—কই না বাবা, বিষ্টির জন্যে ধোপা তো আসেনি এদিন।

—আমার ফরসা কাপড় তোমার বাক্সে আছে ?

—ছেলের আমার সব বিদঘুটে। কাপড় সব নিয়ে গেলি রামনগরের বাসায়। আমার বাক্সে তোর কাপড় থাকবে কোথা থেকে ? তোর কিছু খেয়াল যদি থাকে ! নিজের কাপড়-চোপড়ের পর্যন্ত খেয়াল নেই। একটি বৌমা বাড়িতে না আনলে—

নিধু ঘরের মধ্যে পালাইবার উপক্রম করিতে মা বলিলেন—দাঁড়া, যাসনে কোথাও যেন। একটু মিছরি ভিজিয়ে রেখেচি, আর শশা কেটে—

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিধু দেখিল তাহার ফরসা কাপড় নিজের কাছেও কিছু নাই। আজ সভায় জজগিরি করিবে কি করিয়া তবে? মাকে সেকথা জানাইল। নিধুর মা বলিলেন—তা আমি এখন কি করি বাপু! এ যে অন্যায় কথা হল! কর্তার একটা সেকেলে পাঞ্জাবী আছে সেটা তোর গায়ে হয়?

—তা বোধ হয় হতে পারে। বাবা তো মোটামানুষ নন, আমারই মতো—দেখি কেমন?

কিন্তু শেষে দেখা গেল সে পাঞ্জাবীর গলার কাছে পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে অনেকখানি। তাহা পরিয়া কোথাও যাওয়া চলে না।

নিধুর মা স্মৃতিবিহ্বল দৃষ্টিতে পাঞ্জাবীটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—উনি তৈরি করেছিলেন তখন এই তিন-চার মাস আমাদের বিয়ে হয়েচে। তখন কি চেহারা ছিল কর্তার! চুয়োডাঙায় জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরি করতেন। তোর মতো শনিবার-শনিবার বাড়ি আসতেন—

মায়ের চোখে এমন অতীতের স্বপ্নভরা দৃষ্টি নিধু আরও দু-একবার দেখিয়াছে। তখন সে নিজে চুপ করিয়া থাকে, কোনো কথা বলে না। তাহার মন কেমন করে মায়ের জন্য। বড় ভালোমানুষ। সৎমা বলিয়া নিধু বাল্যকাল হইতেই কখনো ভাবে নাই—তিনিও সৎছেলে বলিয়া দেখেন নাই। নিজের মায়ের কথা নিধুর মনেই হয় না। মা বলিতে সে ইঁহাকেই বোঝে।

—চারুর জামা তোর গায়ে হয় না? দেখি গিয়ে না হয় চারুর মা'র কাছে চেয়ে?

—থাক মা, তোমার এখানে-ওখানে বেড়াতে হবে না জামার জন্যে।

আমি যা আছে তাই গায়ে দিয়ে যাব এখন। কি খেতে দেবে দাও—

হঠাৎ মা ও ছেলে যেন কি দেখিয়া যুগপৎ আড়ষ্ট হইয়া গেল। ভূত নয় অবিশ্যি—সকালবেলা। মঞ্জু সদর দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিয়াছে—সঙ্গে কেহ নাই। সদ্য স্নান করিয়া ভিজে চুল পিঠে এলাইয়া দিয়াছে, চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল রঙয়ের শাড়ি পরনে, তার সঙ্গে ঘোর বেগুনি রঙয়ের ব্লাউজ, খালি পা, হাতে খানকতক বই, মুখে হাসি।

—এস মা-মণি এস, এস—

—কই, সকালে এলুম জ্যাঠাইমা, খাবার কই! খিদে পেয়েচে—নিধুদা কোথায়?

—এই তো এখানে—বোধ হয় ঘরের মধ্যে—বস মা বস।

—নিধুদা কাল বই পড়তে চেয়েছিলেন তাই নিয়ে এলাম।

—তুমি আমাদের লক্ষীমা-টি। বস আমি আসচি—

ইতিমধ্যে নিধু চুল আঁচড়াইয়া ফিটফাট হইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। তাহার পালানোর কারণ তাহার অসংস্কৃত কেশ। বলিল—এই যে মঞ্জু' কখন এলে? ওগুলো কি?

—এগুলো আপনার জন্যে এনেচি—বই—

—দেখি কি-কি বই—

—এখন থাক। আপনি জজ হবেন আবৃত্তি কমপিটিশনে, তা গাঁ সুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েচে জানেন?

—কি রকম?

—বাবার কাছে সব এসে জিগগেস করছিল যে আজ সকালে।

নিধুর মা এই সময় এক বাটি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিলেন—খেতে চাইলে কিন্তু তোমার গরিব জ্যাঠাইমার আর কিছু দেওয়ার—

মঞ্জু কথা শেষ করিতে না দিয়াই প্রতিবাদের সুরে বলিল—অমন যদি বলবেন জ্যাঠাইমা, তাহলে আপনাদের বাড়ি কক্ষনো আসব না— তাহলে ভাবব পর ভাবেন তাই ভদ্রতা করচেন। বাড়ির মেয়ের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কেন? সে যা জুটবে তাই খাবে—কি বলেন নিধুদা? কই নিধুদার কই?

—এই যে ওকেও দিই - মিছরীর জলটা আগে --

—খেয়ে নিধুদা চলুন আমাদের বাড়ি—আবৃত্তির কবিতাগুলো একবার পড়ে নেবেন তো?

—হ্যাঁ ভালোই তো, চল।

নিধুর মা বলিলেন—যাবে এখন মা, এখানে একটু বস। ও পুঁটি, মঞ্জুকে জল দিয়ে যা মা। পান খাবে?

—না জ্যাঠাইমা—পান খেলেও আমি সকালবেলা খাইনে। একটা পান খাই দুপুরে খাওয়ার পর, আর বিকেলে একটা। রাত্রে খাইনে —আমার বড় মামীমার দাঁত খারাপ হয়ে গিয়েচে অতিরিক্ত পান দোক্তা খাওয়ার দরুন। আমি দেখে-শুনে ভয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

মঞ্জু আরও আধঘণ্টা বসিয়া নিধুর মা ও বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করিল। সে যে নিধুকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিল উঠিবার কিছু পূর্বে।

মঞ্জু চলিয়া গেলে নিধুর মা বলিলেন—সামনের রবিবারে ওদের দুই ভাই-বোনকে খাওয়াতে হবে নিমন্তন্ন করে। রোজ-রোজ ওদের বাড়ি খাওয়া হচ্চে—মান থাকে না নইলে—

—বেশ তো মা, তাই কোরো। আমি আসবার সময় রামনগর থেকে কিছু ভালো সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে আসব—কি বল?

—তাই আনিস বাবা। যা ভালো বুঝিস।

সারাদিন হৈ-হৈ করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। নিমন্ত্রণ খাওয়া, মঞ্জুর হাসি, আলাপ, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় সমগ্র গ্রামবাসীর ঈর্ষা প্রশংসা মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুর বাবার ও স্কুল ইনস্পেক্টরের পাশে চেয়ারে বসিয়া আবৃত্তির ভালোমন্দ বিচার করা, আবার সন্ধ্যায় মঞ্জুদের বাড়ি জলখাবার খাওয়া, আবার আড্ডা, গল্প, মঞ্জুর গান, মঞ্জুর হাসি, মঞ্জুর স্নেহবর্ষী-দৃষ্টির প্রসন্ন আলো।

নিধুর মা রাত্রে বলিলেন—হ্যাঁরে তুই নাকি জজবাবুর পাশে বসে কি করেছিলি স্কুলে?

—কে বললে?

—পালিতদের বাড়ি শুনে এলাম। তোর বড্ড সুখ্যাতি করছিল সেখানে সবাই। বললে—হীরের টুকরো ছেলে হয়েচে নিধু, অত বড়-বড় লোকের পাশে বসে ওটুকু ছেলে—

—তা তোমার ছেলে কম কেন হবে বল না?

—আমার বুকখানা শুনে বাবা দশ হাত হল।

নিধুর বাবা বাড়িতে থাকিয়াও বড় কাহারো একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। তিনি পর্যন্ত ডাকিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন সভা সম্বন্ধে। তিনি লোকের মুখে শুনিয়াছেন, সভায় যান নাই—কোথাও বড় যান না।

সোমবার সকাল। সপ্তাহে এমন দিন কেন আসে?

অত ভোরে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। নিধুর মা রাত্রি থাকিতে উঠিয়া ভাত চড়াইয়াছিলেন। স্নান করিয়া দুটি ভাত মুখে দিয়া নিধু পথে বাহির হইল।

কি আশ্চর্য! চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। অত সকালে গ্রামের বাহিরের পাকা রাস্তা দিয়া নৃপেন, বীরেন ও মঞ্জু বেড়াইয়া ফিরিতেছে।

নিধু বলিল—বীরেন যে! কখন এলে?

—কাল অনেক রাত্রে। রাত দশটায় ট্রেনে স্টেশনে নেমে বাড়ি পৌছতে একটা হয়ে গেল।

—তারপর মঞ্জু যে বড় বেড়াতে বেরিয়েচ ? কখনো তো—

—বেড়াতে বেরুইনি। মেজদা কাল রাত্রে পথে ফাউণ্টেন পেন হারিয়ে এসেচে—তাই ভোরে কেউ উঠবার আগে আমরা তিনজনে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। পাওয়া গেল না।

—স্টেশন পর্যন্ত সারা পথ না খুঁজলে—

বীরেন বলিল—তা নয়, পূব-পাড়ার শাম বাগ্দীর বাড়ি পর্যন্ত ফাউণ্টেন পেন পকেটে ছিল। শাম বাগ্দী রামনগরের হাটে গিয়েছিল, তার গাড়ি ফিরছিল—সেই গাড়িতে এলাম। তাকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেচি পেনটা তখনও পকেটে আছে। বাড়ি এসে আর দেখলাম না।

মঞ্জু বলিল—চলো মেজদা, নিধুদাকে একটু এগিয়ে দিই।

নিধু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে চাহিল। মঞ্জু বলিল—খেয়ে যাবেন নিধুদা?

—মা কি না খাইয়ে ছেড়েছেন ? সেটি হবার যো নেই তাঁর কাছে। সেই কোন ভোরে উঠে—

—চমৎকার মানুষ বটে জ্যাঠাইমা। সামনের শনিবারে আসা চাই নিধুদা।

—আসব বই কি—

—পুজো তো এসে গেল, পুজোর সময় আমরা সবাই মিলে একটা ছোটখাটো প্লে করব—আপনি আসুন, সামনের রবিবারে তার পরামর্শ করা যাবে। মেজদা এসেচে, বড়দাও সামনের হপ্তায় আসবে। বেশ মজা হবে।

—কে অরুণবাবু ? তাঁকে কখনো দেখিনি।

—দেখবেন এখন সামনের রবিবারে।

—তোমরা যাও মঞ্জু, আর আসতে হবে না।

—আর একটু যাই—ওই সাঁকোটা পর্যন্ত—ভারি ভালো লাগে শরতের সকালে বেড়াতে। কি সবুজ গাছপালা! চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার কাছে এসব নতুন।

—তুমি এর আগে পাড়াগাঁ দেখনি বুঝি মঞ্জু?

—মধুপুর দেখেচি ডুম্‌কা দেখেচি। বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম—

সাঁকোর কাছে গিয়া সকলে সাঁকোর উপর কিছুক্ষণ বসিল। বীরেন বলিল—মঞ্জু একটা গান কর তো? বেশ লাগছে সকালটা। নিধুও সে অনুরোধে যোগ দিল। মঞ্জু দু-তিনটি গান গাহিল। ক্রমে বেলা উঠিয়া গেল। দুধারের গাছপালার মাথায় শরতের রৌদ্র ঝলমল করিতে লাগিল। নিধু উহাদের কাছে বিদায় লইয়া জোর পায়ে পথ হাঁটিতে লাগিল।

সেদিন এজলাসে ঢুকিতেই সাবডেপুটি সুনীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নিধিরামবাবু, লালবিহারীবাবুকে আমার খবরটা দিয়েছিলেন তো?

সর্বনাশ! নিধু তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! সে কথা একেবারেই তাহার মনে ছিল না! মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কোনো কথাই ছাই মনে থাকে না।

সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—হুজুর—খবরটা দেওয়া হয়নি। আমার বাড়িতে অসুখবিসুখ—উনিও স্কুলে কি সব কাজে বড় ব্যস্ত—বড়ই দুঃখিত—

—না, না, সেজন্যে কি? সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। দেখি যদি সুবিধে পাই—সামনের রবিবারে আমি নিজেই সাইকেল করে যাব। সামনের শনিবারে আপনি শুধু জানিয়ে দেবেন দয়া করে যে আমি রবিবারে যেতে পারি। তাহলেই হল।

সাধন-মোক্তার ফৌজদারী কোর্টের বটতলা হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া

তাহার দিকে আসিতেছিলেন, সবডেপুটির এজলাসের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিধু একেবারে সাধনের সামনে গিয়া পড়িল।

— আরে এই যে নিধিরাম, আজ এলে সকালে? বেশ, বেশ। চল একটা জামিননামা আছে, যত্নদা তোমায় খুঁজছিলেন যে, দেখা হয়েচে?

—আজ্ঞে না—এই তো আমি পা দিয়েছি কোর্টে। কারো সঙ্গে এখনো—

—সুনীলের এজলাসে কি কেস ছিল?

সাধন-মোক্তার প্রবীণ লোক—সবডেপুটির সামনাসামনি যদিও কখনো 'হুজুর' ছাড়া সম্বোধন করেন না কিন্তু সেই সাবডেপুটি বা অন্য জুনিয়ার হাকিমদের প্রথম পুরুষে উল্লেখ করিবার সময় তাহাদের নামের শেষে 'বাবু' পর্যন্ত যোগ করেন না—ইহাতে সাধন ভাবেন তাঁহার চরিত্রের নির্ভীকতা প্রকাশ পায়।

নিধু তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়া যত্ন-মোক্তারের খোঁজে গেল। বার-লাইব্রেরীতে যত্ন বাঁড়ুয্যে, ধরণী পাল ও হরিবাবু বসিয়া কি লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন—এমন সময় নিধুকে ঢুকিতে দেখিয়া যত্ন বলিলেন

—আরে নিধিরাম যে এস! সেদিনের রূপনারাণপুরের মারামারির কেসের রায় আজ রেরুবে—আসামী দুজন এখনো এসে পৌছল না। ওদের টাকা আগে হাত করতে হবে—নয়তো কিছু দেবে না—তুমি এখানে বসে থাক। তুমিও তো কেসে ছিলে, তোমারও পাওনা আছে। ওরা এলে কোর্ট মুখো যেন না হয়।

— কেন?

—আসামী সব বেকসুর খালাস হয়েচে রায়ে। আমি খবর নিয়েচি।

—এ তো ভালো কথা। তবে তারা এলে—যা টাকা বাকি আছে—

ধরণী ও হরি-মোক্তার নিধুর কথা শুনিয়া হাসিলেন। যত্ন বাঁড়ুয্যে মুখে হতাশার ভাব আনিয়া বলিলেন—জুনিয়ার মোক্তার কিনা, এখনো

গায়ে স্কুল কলেজের বেঞ্চির গন্ধ! বুঝতে তোমার এখনো অনেক দেরি, বাবা।

নিধু জিনিসটা এখনো ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই দেখিয়া প্রবীণ হরি-মোক্তার বলিলেন—নিধিরামবাবু, বুঝলেন না? আসামী যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে সে খালাস পাবে, তবে সে আপনাকে বা যদুদাকে আর সিকি পয়সাও ঠ্যাকাবে না। কোর্টের ওদিকে গেলে ওই পেস্কার-টেস্কার পয়সা আদায় করার জন্যে খবরটা শুনিয়ে দেবে—কারণ সবাই তো ওৎ পেতে আছে পরের ঘাড় ভাঙবার—

—আজ্ঞে বুঝেচি হরিদা—এই যে এরা এসেচে। রূপনারাণপুরের সেই মক্কেল দুজন—

যদুবাবু অমনি তাহাদের উপর যেন ছোঁ মারিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই যে, এলে? এস বস বাবা। খবর তো বড় খারাপ।

আগন্তুক মক্কেল দুটি পল্লীগ্রামের লোক, পরনে হাটু পর্যন্ত তোলা ময়লা কাপড়, পায়ে কাদা, গায়ে ময়লা আকার-প্রকার-হীন পিরাণ বা ফতুয়ার উপর গামছা ফেলা—বগলে ছোট পুঁটলি। ইহাদের মধ্যে একজনের চেহারা খুব লম্বা-চওড়া, একমুখ দাড়ি, গোল-গোল ভাঁটার মতো চোখ—দেখিলে মনে হয় বেশ বলবান, তবে নিরীহ ও নির্বোধ ধরনের।

দুজনেই উৎসুক ভাবে বলিল—কি খবর বাবু?

—খবর খারাপ। হাকিম খুব চটেচেন—

—কার ওপর চটলেন বাবু?

—তোমাদের দুজনের ওপর। জেলে যেতে হবে। রায়ের গতিক ভালো নয়। আজ একবার হদ্দমুদ্দ শেষ চেষ্টা করে দেখি যদি খালাস করতে পারি—কিন্তু—

এই সময় যদু বাঁড়ুয্যে নিধুর হাতে একটা স্লিপে কি লিখিয়া দিলেন।

নিধু স্লিপটা পড়িয়া বলিল—বাবু আজ বিশেষ চেষ্টা করবেন তোমাদের জন্তে, তিন টাকা তেরো আনা 'ন' পাই প্রত্যেকের খরচ চাই—

—বাবু, ট্যাকা তো অত মোরা আনিনি ? মোরা জানি রায় বেরুবে—

যদু বাঁড়ুয্যে মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—রায় বেরুবে ? রায়ে তোমাকে একেবারে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবে যে ! যাও গিয়ে এখন দুটি বচ্ছর ধরে ঘানি টানো গে যাও জেলে—তবে তোমাদের চৈতন্য হবে। সেদিন কি বলে দিয়েছিলাম ?

—তা বাবু, বলে তো দেলেন—কিন্তু ইদিকে যে মোদের দিন চলে না এমনডা হয়েচে। এই মোকর্দমার এপর্যন্ত বাইশ-তেইশ টাকা উকীল-মোক্তারের দেনা, আর পুলিশ—

—ওসব প্যানপ্যানানি রাখ্‌গে যা তুলে। টাকা না আনিস, এক পা নড়ব না এখান থেকে—দেখি কি হয়—ক-বছর ঘানি টানতে হয় দেখি একবার—

—না বাবু আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন—আমি ট্যাকার সন্ধান করে আনচি—বাজারের দিকি যাই—আমাদের গাঁয়ের দুটো লোক এয়েচে—তাদের কাছে—

—তা যা শিগগির যা—আর শোন্, একটা কথা—কাছে আয়—

তাহারা কাছে সরিয়া আসিলে যদু-মোক্তার গলার সুর নিচু করিয়া বলিলেন—খবরদার যেন কোর্টের দিকে যাবিনে—তোদের দেখলে হাকিমের রাগ হবে—শেষকালে বাঁচাতে পারব না তোদের—টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে চুপটি করে এই বারলাইব্রেরীতে বারান্দায় বসে থাকবি বুঝলি ?

—বেশ বাবু, যা বলবেন।

লোক দুটি চলিয়া গেলে হরি ও ধরণী-মোক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইবার উপক্রম করিলেন। হরি-মোক্তার বলিলেন—বাবা, পাকা

লোক যদু-দা ! ওঁর কাছে মক্কেলের চালাকি ? না কোর্টের আমলাদের চালাকি ?

যদু সগর্বে বলিলেন—আরে ভায়া, টাকা রয়েচে ওদের কাছে। দেবে না—দিতে চায় না। এই কাজ করচি এই রামনগরের কোর্টে আজ চল্লিশ বছর প্রায়। দেখে-দেখে ঘুণ হয়ে গেলাম। এখুনি দেখ এসে টাকা দিয়ে যাবে। বাইরে দুজনে পরামর্শ করতে গেল আর কাছা থেকে টাকা খুলতে গেল। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি এই দেখে আসচি—কত হাকিম এল, কত হাকিম গেল ! রমেশ দত্তকে এই কোর্টে দেখেচি—তখন তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট—সিভিলিয়ান রমেশ দত্ত—আমি আজকের লোক নই ! নিধুকে ডাকিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বলিলেন—তুমি বস এখানে। আমি এজলাসে যাব একবার। কোথাও যেও না টাকা আদায় না করে।

আজ বারো মাসের মোক্তারী জীবনে নিধু এরকম অনেক দেখিল। এক-একবার তাহার মনে হয় এর চেয়ে স্কুল-মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল। এ দুঃখের কথা—পলে-পলে মনুষ্যত্বের এই মরণ—কাহার কাছে এসব কথা ব্যক্ত করিবে সে ?

একজন মাত্র মানুষ আছে। সে মঞ্জু। মঞ্জুর কাছে সামনের শনিবারে সব সে খুলিয়া বলিবে ! এ জীবন আর ভালো লাগে না।

কোর্টের কাজ সারিয়া বাহির হইতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। সাধন-মোক্তার তাহাকে বাসায় যাইবার পথে ধরিয়া বসিলেন—ওহে নিধিরাম শোনো শোনো। আমার সে ব্যাপারটা—

—আজ্ঞে, বুঝেচি। সে এখন হবে না।

—কেন বল তো ? জিগগেস করেছিলে বাড়িতে ?

—বাড়িতে আর জিগগেস করব ? এখন নিজেরই মন নেই। এই তো রোজগারের দশা—দেখচেন তো সব।

—ওসব কথা কাজের নয় হে। তুমি ছেলেমানুষ এখুনি কি রোজগার করতে চাও? দিন যাক, সিনিয়র মোক্তারগুলো আগে পটল তুলুক।

—ততদিনে আমাকেও পটল তুলতে হবে দাদা।

—তুমি ভুল করচো ভায়া। ভেবে দেখ আগে! তোমাকে এ কাজ করতেই হবে - বাড়িতে এরা তোমাকে পছন্দ—

নিধু বাসায় আসিয়া দোর খুলিল। এখানে নিজেরই রাঁধিতে হয়, একটা ছোকরা চাকর কাজকর্ম করে। ঘর-দোর বড় অপরিষ্কার দেখিয়া সে চাকরটিকে ডাকিয়া ধমক দিল। বলিল—উনুনে আঁচ দে, রান্না চড়িয়ে দেব। ভালো বিপদে ফেলিয়াছে সাধন-মোক্তার! বাড়িতে পছন্দ করিয়াছে তো তাহার কি? কাল সকালে স্পষ্ট জবাব দিয়া দিবে।

হাত মুখ ধুইয়া রান্না চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাবডেপুটির আরদালি আসিয়া একখানা পত্র তাহার হাতে দিল।

সুনীলবাবু তাহাকে একবার এখনি দেখা করিতে লিখিয়াছেন। সেখানেই সে চা খাইবে।

সন্ধ্যা তখনো হয় নাই। সুনীলবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া মুন্সেফবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছেন।

—আসুন নিধিরামবাবু, বসুন। আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করচি, কেউ চা খাইনি—

—আজ্ঞে, আমি তো চা খাইনে—আপনারা খান। নমস্কার মুন্সেফবাবু, বেশ ভালো আছেন?

মুন্সেফবাবুটি নবাগত। সুনীলবাবু নিধুর পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন—এঁর কথাই বলছিলাম। বেশ প্রমিসিং মুকটিয়ার, যদিও এই সবে—

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনার নাম শুনেচি এঁর মুখে নিধিরামবাবু। আপনার বাড়ি বুঝি লালবিহারীবাবুর স্বগ্রামে?

—আজ্ঞে। আপনি তাঁকে চেনেন?

—হ্যাঁ—আলাপ নেই—তবে একই সার্ভিসের লোক, যদিও তিনি আমাদের ঢের সিনিয়র। নাম খুব জানি। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগগেস করব—

—আজ্ঞে বলুন—

—লালবিহারীবাবুর বড় ছেলে অরুণকে আপনি জানেন?

—দেখিনি তবে নাম শুনেচি—তিনি এখানে আসেননি—তবে শুনচি সামনের রবিবার নাকি আসবেন।

সুনীলবাবু বলিলেন—তবে তো ভালো হল অমরবাবু, চলুন আপনিও সামনের রবিবারে ওঁদের ওখানে। অরুণবাবুকে দেখে আসবেন- কি বলেন নিধিরামবাবু?

—আজ্ঞে এ তো খুব ভালো কথা।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাকে বলি, আমার একটি ভাগ্নীর সঙ্গে অরুণবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হয়েচে—মানে এখনোও ফরম্যালি করা হয়নি ওঁদের সঙ্গে—আমরা দেখে এসে—

—আজ্ঞে খুব ভালো কথা।

সুনীলবাবু বলিলেন—আমরা রবিবারে যাব দুজনে। আপনি দয়া করে শুধু লালবিহারীবাবুকে যদি জানিয়ে রাখেন—

—এ আর বেশি কথা কি বলুন—আমি নিশ্চয়ই বলব এখন। আজ্ঞে না, আমি তো চা খাইনে—এ কাপ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা বাড়তি কাপ আমাদের এখানে দিয়ে যা, চা ফেলা যাবে না আমাদের কাছে—কি বলেন অমরবাবু? আপনাকে কি ওভালটিন দেবে?

—আজ্ঞে না, আমি শুধু এই খাবার—একগ্লাশ জল দিলেই—

—ওরে বাবুকে একগ্লাশ জল—আর পান নিয়ে আয় তিন খিলি—

আরও আধঘণ্টা কথাবার্তার পরে নিধিরাম বিদায় লইয়া বাসায় আসিল। তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল। এত বড়-বড় অফিসারের সঙ্গে বসিয়া চা খাইয়া আড্ডা দিবে—সে কখনো ভাবিয়াছিল? গ্রামে তাহারা অত্যন্ত গরিব—তাহার বাবা তো কোথাও মুখ পান না গরিব বলিয়া। কাছারীর নায়েব দুবেলা ডাকিয়া শাসন করে। আর আজ সে কি না মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের সঙ্গে সমানে-সমানে বসিয়া জলখাবার খাইল, গল্পগুজব করিল। গ্রামে গিয়া একটা গল্প করিবার জিনিস হইয়াছে বটে! কিন্তু তাহার চেয়েও—এ সবের চেয়েও গর্বের বিষয় তাহার জীবনে—[illegible] সঙ্গে আলাপ, মঞ্জুর মতো শিক্ষিতা, সুন্দরী, বড় দরের গভর্ণমেণ্ট অফিসারের মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ, তাহার বন্ধুত্ব।

তাহার এ সৌভাগ্যের তুলনা হয়? কজনের ভাগ্যে এমন ঘটে?

কিন্তু মুশকিল ঘটিয়া গেল। সামনের রবিবারে যদি ইহারা গিয়া উপস্থিত হন, তবে গোলমালে এমন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে যে মঞ্জুর সহিত দেখা-শোনা হয়তো ঘটিয়াই উঠিবে না। তাহাদের গ্রামে যখন ইঁহারা যাইতেছেন—তখন তাহাকে ইঁহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে—[illegible] সহিত সে দেখা করিবে কখন? মঞ্জু যে বলিয়াছিল আগামী রবিবারে অভিনয়ের সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে—সে সব গেল উল্টাইয়া। তাহার সময় কই? সামনের রবিবার একেবারে মাটি।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যে কতকটা অবিশ্বাস, কতকটা আগ্রহের সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ হে নিধু, সুনীলবাবু আর মুন্সেফবাবু নাকি সামনের হপ্তায় তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ি যাচ্ছেন?

নিধু হাসিয়া বলিল—কে বললে?

—সব শুনতে পাই হে, সব কানে আসে। পেস্কারবাবুর মুখে শুনলাম। সুনীলবাবুর চাপরাসি বলেচে।

—আজ্ঞে হ্যা কাকা, তবে আমাদের বাড়ি তো নয়—আমাদের প্রতিবেশী লালবিহারীবাবু মুন্সেফ—তাঁদেরই বাড়ি।

—সে যাই হোক, তুমিও একটু তোমার বাড়িতে নিয়ে যেও, খাতির যত্ন কোরো হে। হাকিমদের বাড়ি যাতায়াত করলে বা হাকিম বাড়িতে যাতায়াত করলে মক্কেলের চোখে উকীল-মোক্তারের কদর বেড়ে যায়—ও একটা মস্ত খাতির হে!

যত্ন-মোক্তার যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল।

তিনি এতকাল রামনগরে মোক্তারি করিতেছেন—তাঁহার এখানে শহরের বাসায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে অনেকবার হাকিমদের পদধূলি যে না পড়িয়াছে তাহা নয়—কিন্তু কই, কোনো হাকিম তো তাঁহার পৈতৃক গ্রামের বাঁশবনের অন্ধকারে কখনো যান নাই? এ মান অনেক বড়, এর মূল্য অনেক বেশি। এই অর্বাচীন জুনিয়ার মোক্তারটার অদৃষ্টে কিনা শেষে এই সম্মান জুটিল!

শনিবার সুনীলবাবু নিধুকে এজলাসে বলিলেন—লালবিহারীবাবুর নামে চিঠি আর দিলাম না, বুঝলেন? যদি না যাওয়া হয়? আপনি মুখেই বলবেন—

বাড়ি যাইবার পথে নিধু কতবার ভাবিল—তাই যেন হয় হে ভগবান! ওদের যাওয়া যেন না ঘটে!

যত্ন-মোক্তারের বর্ণিত মান খাতির বা মক্কেলের চোখে মূল্যবৃদ্ধি সে চায় না বর্তমানে—শনি-রবিবারগুলি যেন এ ভাবে নষ্ট না হয়—ভগবানের কাছে এই তাহার প্রার্থনা। মক্কেলের মান খাতিরে কি হইবে?

বাড়ি পৌছিয়া বিপদের উপর বিপদ—তাহার এক বৃদ্ধ মেসোমশায় আসিয়াছেন, তাঁহার বকুনিরও বিরাম নাই, তামাক খাওয়ারও বিরাম নাই। নিধুকে দেখিয়া তিনি যেন তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন, বাজে বকুনিতে

নিধুর কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। নিধুর মাকে দেখাইয়া বলিলেন—চিনু তো কালকের মেয়ে। আমি যখন ওর জ্যাঠতুতো দিদিকে বিয়ে করি, তখন চিনুর বয়স কত—এতটুকু মেয়ে! রাঙা ছোট্ট শাড়ি পরে গুটগুট করে হাঁটত! বস হে নিধুবাবু, তোমরা হলে আমার নাতির বয়সী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। মেসোমশায় তাহাকে আর ছাড়েন না। তিনি কোন কালে চা-বাগানে কাজ করিতেন সেই আমলের সব গল্প। নিধুর মা তাহার পিতার বয়সী ভগ্নীপতির ঘন-ঘন তদারক করিতেছেন—বাড়িসুদ্ধ সরগরম। আজ কি মঞ্জুও একবার খোঁজ লইল না?

নিধুর মন রীতিমতো দমিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে নিধু একবার বাড়ির বাহির হইল। লাল-বিহারীবাবুর বাড়িতে যাইবার খুব ভালো অজুহাত তাহার রহিয়াছে। হাকিমবাবুদের আসিবার সংবাদটা দেওয়া। সে চাহিয়া দেখিল উহাদের বৈঠকখানায় তাহার বাবা বসিয়া আছেন–পাড়ার আরও দু-একটি বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত। দাবা খেলা চলিতেছে।

নিধু ঘরে ঢুকিতেই লালবিহারীবাবু বলিলেন—আরে নিধু যে! এখন এলে? এস-এস—

—আজ্ঞে কাকাবাবু, একটা কথা বলতে এলাম। আমাদের সাবডেপুটি সুনীলবাবু আর মুন্সেফ অমরবাবু কাল আপনার বাড়ি বেড়াতে আসবেন বলে দিয়েচেন—

ও! সুনীল। সিমলে তাঁতিপাড়ার সুনীল–বুঝেচি! জগৎতারণের ছেলে সুনীল।—তবে অমরবাবুকে তো আমি ঠিক চিনিনে। নাম শুনেচি বটে। ছোকরা মতো—না? হ্যা তাই হবে—আমাদের সার্ভিসের সিনিয়ার লোকদের অনেককেই জানি কিনা! অমরবাবু ছোকরাই হবে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়েস বেশি নয়—নতুনও খুব নয়, পাঁচ-ছ-বছরের সার্ভিস।

—ওই হল—আমাদের সার্ভিসে ওসব জুনিয়ারের দল। তা তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে তোমার কাকীমাকে কথাটা বোলো হে—

নিধু দুরু-দুরু বক্ষে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝি বসিয়া কি করিতেছে, দু-একটা চাকর ঘুরিতেছে—আর কেহ নাই। নিধু ঝিকে বলিল—কাকীমা কোথায় ?

—এই তো এখানে ছিলেন—দেখুন বোধ হয় ঘরের মধ্যে কি দোতলায়—

—ও কাকীমা—

দোতলার জানালায় মুখ বাড়াইয়া মঞ্জুই জিজ্ঞাসা করিল—কে ?

নিধুর বুকে কিসের ঢেউ হঠাৎ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল—বুক হইতে গলা পর্যন্ত যেন অবশ হইয়া গেল। সে দিশেহারা ভাবে উত্তর দিতে গেল—এই যে আমি—আমি নিধু—

—নিধুদা ? বেশ, বেশ লোক যা হোক—দাঁড়ান যাচ্চি—

মঞ্জু জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল। চক্ষের পলকে সে একেবারে নিচের বারান্দার দোরের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—বা রে, আপনি কেমন লোক বলুন তো নিধুদা ? কখন এলেন বাড়ি ?

—সন্দের আগে এসেচি তো—

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? আমি আপনার জন্যে কতক্ষণ বসে। নিজে চা করলাম বাবা খেতে চেয়েছিলেন বলে—আপনার জন্যে রেখে বসে-বসে এই আসেন, এই আসেন—ও মা, একেবারে রাত নটার সময় এলেন ?

নিধু অভিমানের সুরে বলিল—তা তুমিও তো খোঁজ করনি মঞ্জু ?

—আমি দুবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি যে—কেন জ্যাঠাইমা বলেননি ?

—কৈ, না তো ?

—বাঃ সন্দের আগে বিকেলের দিকে দুবার নৃপেন গিয়েচে—আপনাদের

বাড়ি কে এক ভদ্রলোক এসেচেন, তিনি ওকে ডেকে গল্প করলেন—কাছে বসালেন—ও বলছিল আমায়—তাহলে জ্যাঠাইমা বলতে ভুলে গিয়েচেন। ব্যস্ত আছেন কিনা অতিথি নিয়ে। আসুন বসুন—দালানের মধ্যে বসবেন না রোয়াকে? আজ বড্ড গরম—ভাদ্র মাসের গুমট—

—রোয়াকেই বসি বেশ হাওয়া আছে—

মঞ্জু যেন খানিকটা আপন মনেই বলিল—দেখুন তো চপগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এখন কি খেতে ভালো লাগে? বিকেলে বেশ গরম ছিল—খেয়ে কিন্তু নিন্দে করতে পারবেন না।

নিধু হাসিয়া বলিল—কেন, নিন্দেই তো করব, খারাপ হলেও ভালো বলতে হবে?

—খারাপ কক্ষনো হয়নি। রান্নায় আমি স্কুলে সার্টিফিকেট পেয়েছি—জানেন তা? তবে জুড়িয়ে গেলে—আপনি বসুন, আমি ওগুলো গরম করে নিয়ে আসি—

আধঘণ্টা পরে মঞ্জু, নৃপেন, বীরেন ও নিধু বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ মঞ্জু বলিল—চলুন ছাদে যাই নিধুদা, বড় গরম এখানে—চল মেজদা—

সবাই মিলিয়া খোলা ছাদে সতরঞ্চি পাতিয়া আসর জমাইল। নানা ভূতের গল্প, শহরের গল্প, বীরেনের মুখে উৎসাহের সহিত বর্ণিত গত সপ্তাহে কলিকাতায় ফুটবল খেলার গল্প ইত্যাদিতে আড্ডা মুখর হইয়া উঠিল। ছাদের ওপারে নুইয়া পড়া বাঁশঝাড়ে রাতচরা কোনো পাখির ডানা ঝটাপটি। পরিষ্কার শরতের আকাশে সুস্পষ্ট জ্বলজ্বলে নক্ষত্ররাজি ও টেঁচা ছায়াপথ।

নিধু যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। জীবনে যেন সে এই প্রথম আনন্দ কাহাকে বলে জানিয়াছে। এরা কত ভালো-ভালো জায়গার গল্প বলিতেছে, কখনো নিধু সে সব দেশে যায়ও নাই—কলিকাতায় গেলেও সেখানকার

শিক্ষিত বড়লোকদের সঙ্গে এদের মতো মেশেও নাই—জজ-মুন্সেফের বাড়িতে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এত রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া গল্পগুজব করিবে—আর বছর এমন সময় সে-ই কি সে কথা ভাবিতে পারিত ?

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—যেজন্য সে বাড়ির ভিতর আসিয়াছিল—সুনীল-বাবু ও মুন্সেফ্‌বাবুর আসার কথা বলিতে—সেকথা এখনো বলা হয় নাই। মঞ্জুকে দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। কথাটা সে এ আসরেই বলিল।

বীরেন বলিল—ও ! সুনীলবাবু এখানে এসেচেন নাকি সাবডেপুটি হয়ে ? তা তো জানিনে !

—তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি ?

—খুব। সিমলেতে আমাদের মামারবাড়ির পাশের বাড়িতেই—

মঞ্জু বলিল—ওঁর বোন ভানু আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত—গত বছর বিয়ে হয়ে গেল। খুব জাঁকের বিয়ে। সুনীলবাবুর বাবা বেশ বড়লোক—তিনিও রিটায়ার্ড'সাবজজ—

—কাল এলে কখন আসবেন ?

—বোধহয় সকালের দিকেই—কাকীমাকে বোলো বীরেন। আমি বলতে ভুলেই গিয়েচি—

রাত্রে নিধুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে কাল বলব নাকি খেতে মঞ্জুদের ? বীরেনও যে এসেচে—তাকেও বলতে হয়।

—কিন্তু মা, কাল একটু গোলমাল আছে। সাবডেপুটি আর মুন্সেফবাবু আসবেন বেড়াতে ওদের বাড়ি। কাল দরকার নেই—সেই সব নিয়ে ওরা কাল ব্যস্ত থাকবে।

সকালে উঠিয়া নিধু রামনগরের পাকা রাস্তার উপর পায়চারি করিল বেলা আটটা পর্যন্ত। তখনো পর্যন্ত কাহাকেও আসিতে দেখা গেল না। না আসিলেই ভালো। দিনটা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে

উহারা আসিলে। এত বেলা যখন হইয়া গেল—হয়তো আর আসিবে না। সাড়ে-আটটা পর্যন্ত রাস্তার উপর অপেক্ষা করিয়া নিধু বাড়ি ফিরিতেছে, পথে নৃপেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—বারে, কোথায় গিয়েছিলেন বেড়াতে ? আপনার বাড়ি বসে-বসে—

—কেন ?

—দিদি সেই সাড়ে-সাতটার সময় আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েচে—জল-খাবার খাবেন বলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে—

—আচ্ছা, তুমি যাও নৃপেন। আমি নেয়ে নিই পুকুরে—তারপর যাচ্ছি—

স্নান সারিয়া ফিটফাট হইয়া মঞ্জুদের বাড়ি যাইতে নটা বাজিয়া গেল। বাড়ির ভিতর পা না দিতেই মঞ্জু রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বলিল—আজ-কাল আপনার হয়েচে কি ? লুচি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কখন ডাকতে পাঠিয়েচি নৃপেনকে—বেশ লোক যা হোক !

মঞ্জুর মা বসিয়া নিজের হাতেই ওল কুটিতেছেন, তিনিও বলিলেন—এস বাবা। মঞ্জু এখনো খায়নি, বলে—অতিথিকে না খাইয়ে আগে খেতে নেই। আমি বললাম, ও তো ঘরের ছেলে, ও আবার অতিথি কোথায় মা, তুই খেয়ে নে। মেয়ের সবই বাড়াবাড়ি।

নিধু অপ্রতিভ হইল। সঙ্গে-সঙ্গে এক অপূর্ব উত্তেজনা ও আনন্দে তাহার সারা শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। মঞ্জু না খাইয়া আছে সে খায় নাই বলিয়া—কেন ? কই, কোনো মেয়ে তো এ পর্যন্ত তাহার না খাওয়ার জন্ত নিজেকে অভুক্ত রাখে নাই ! অন্তত কোনো শিক্ষিতা তরুণী বড়লোকের মেয়ে তো নয়ই। নিজের সৌভাগ্যকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারে না। মঞ্জু তাহাকে ভিতরের ঘরের বারান্দায় খাইতে দিয়া কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আজ যে সেই প্লে সিলেক্ট করার দিন—তাও আপনি ভুলে বসে আছেন নিধুদা ?

—কেন ভুলব ? তবে আজ অরুণবাবুর আসার কথা ছিল না ?

— বড়দা বেলা বারোটার কম কি পৌছবেন এখানে ? যদি আসেন তে ওবেলা সবাই মিলে বসে—

—আচ্ছা, মঞ্জু একটা কথা বলব ?

—কি ?

—তুমি না খেয়ে রইলে কেন এত বেলা পর্যন্ত ? অন্যায় নয় তোমার ? কাকীমা কি ভাবলেন ?

—মা আবার কি ভাববেন—বারে !

নিধুর একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি আসিয়া জুটিল—কেউ কোনো দিকে নাই দেখিয়া সে স্বর নামাইয়া বলিল—ভাবচেন কি শুনবে ? ভাবচেন মঞ্জুর সঙ্গে নিধুর খুব ভাবসাব হয়েচে কিনা, তাই ও না খেলে মেয়েও খায় না—

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—ভদ্রলোকের বাড়িতে বসে ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে 'এ সব কি কথাবার্তা হচ্চে ?

নিধু হাসিমুখে বলিল—বেশ করচি যাও। কাকীমা ভাবতে পারে কিনা বল ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত কি আর সাধে বলে ?

—আর তোমার পৈতৃক ভিটেও তো এই পাড়াগায়েই—বিলেত থেকে তো আসনি ?

—না এসেচি তো না এসেচি—যান্—কি হবে তার ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত বলে তাহলে আমায় গালাগাল দেওয়াটা কি ভালো তবে ?

এমন সময় হঠাৎ বীরেন ও নৃপেন এক সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ও নিধুদা, ও দিদি—ওঁরা সব এসেচেন—মুন্সেফ অমরবাবু আর সাবডেপুটি—বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে—আসুন শিগগির—

—আমার কথা ওঁরা জিগগেস করলেন নাকি ?

—না তা কিছু বলেননি তবে বলছিলেন আপনাকে দিয়ে খবর দেওয়া ছিল—

মঞ্জু বলিল—অত তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে গিলতে হবে না। এমন তো লাটসাহেব কেউ আসেনি—ও লুচি দুখানা খেয়ে নিয়েই—একটু পরেই না হয়—আপনাকে তো তাঁরা ডেকে পাঠাননি—

কিন্তু নিধুর পক্ষে ধীরে সুস্থে বসিয়া-বসিয়া লুচি খাওয়া আর সম্ভব না। যাঁহারা আসিয়াছেন—তাঁহারা তাহার পক্ষে লাটসাহেবই বটে। এ অবস্থায় আর থাকা চলে না।

নিধু একপ্রকার ছুটিতে-ছুটিতে বাহিরে আসিল।

বৈঠকখানায় অনেক লোক। লালবিহারীবাবু, নিধুর বাবা, সাবডেপুটি ও মুন্সেফবাবু, উপেন হালদার ও স্থানীয় স্কুলের পণ্ডিত উমাপদ ভট্টাচার্য সকলে মিলিয়া বসিয়া পল্লীগ্রামের বর্তমান দুর্দশার কথা আলোচনা করিতেছেন।

সুনীলবাবু নিধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে এই যে নিধিরামবাবু! মশাই, রাস্তা বড় ভয়ানক, জায়গায়-জায়গায় এমন কাদা যে সাইকেল চলে না—কাঁধে তুলে আনতে হয়েচে—বসুন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাদের বাড়িটা কোন দিকে? আমরা সেখানেও যাব—

নিধুর বাবা রামতারণ বিনয়ে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিলেন—যাবেন বই কি! গরিবের কুঁড়েতে আপনাদের মতো মহৎ লোকের পায়ের ধুলো পড়বে এ আমরা আশা করতে পারিনে—লালবিহারী ভায়া আমাদের গ্রামের চুড়ো—উনি আজ এসেচেন বলেই আপনাদের মতো লোকের—

সকলে মিলিয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। গ্রামে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দির ছাড়া অন্য কিছুই নাই। উমাপদ পণ্ডিত সেটির মধ্যে নিজে ঢুকিয়া সকলকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। সাপের ভয়ে কেহই ভিতরে গেল না—কবাটহীন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

নিধুর বাড়ির বাহিরের ঘরেও সকলে একবার আসিয়া বসিলেন। নিধু চা ও খাবারের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল—সকলকে রেকাবি

করিয়া খাবার দেওয়া হইল—সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু ছাড়া আর কেহ খাইতে চাহিলেন না। কারণ বাকি সকলে বৃদ্ধ—উঁহারা সান্ধ্যাহ্নিক না করিয়া খাইবেন না। সকলে মিলিয়া আবার মঞ্জুদের বাড়ি ফিরিল। সুনীলবাবুকে মঞ্জুর মা বাড়ির ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বীরেন তাঁহাকে লইয়া গেল। নিধু সঙ্গেই দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু তাহাকে বীরেন যেন দেখিতেই পাইল না আজ।

নিধু বাড়ি ফিরিয়া আসিতেই তাহার মা বলিলেন—হ্যাঁরে, মোহনভোগ খারাপ হয়নি তো?

—কেন খারাপ হবে? বেশ হয়েছিল—

—ওঁরা খেয়েছিলেন তো? হাকিমবাবুরা?

—সবটা খেয়েছিল। ভালো হলে খাবে না কেন?

—হ্যাঁরে তুই এখানে খাবি না জজবাবুদের বাড়ি খেতে বলেচে?

এ ধরনের সোজা প্রশ্নের উত্তরে নিধু প্রথমটা কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। পরে বলিল—না—বাড়িতেই খাব। ওরা খেতে বলেছিল, কিন্তু আমার লজ্জা করে মা রোজ-রোজ ওদের বাড়ি—

নিধুর মা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—তা আজকের দিনটা কেন খেলিনে—ভালোটা-মন্দটা হত—বড়-বড় বাবুরা এসেছে বাড়িতে—

—তা হোক মা—ফি রবিবারেই তো ওখানে খাচ্চি। তোমার হাতের রান্না খাওয়া বরং হয়েই ওঠে না আজকাল।

নিধুর মা মনে-মনে খুশি হইলেন। ছেলের মতো ছেলে নিধু। এখন বাঁচিয়া থাকিলে হয়। আজ তাহার দৌলতেই তো তাঁহাদের খড়ের ঘরে হাকিম-হুকুমের পায়ের ধূলা পড়িল! বংশের মুখ উজ্জ্বল-করা ছেলে বটে।

দুপুরের পরেই তিনি পুকুরের ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া বুঝিলেন কথাটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে।

তিনুর মা বুড় রায়গিন্নি বলিলেন—হ্যাঁরে ও নতুন বৌ, তোদের বাড়ি নাকি রামনগর থেকে ডিপ্‌টিবাবু আর মন্‌সববাবু এসেছিল ?

—হ্যাঁ দিদি—কার মুখে শুনলে ?

—ওমা এই দক্ষ পিসি বললে—জগোঠাকরুণ তাকে বলেছে। সকলেই তো বলচে। তা বেশ, ভালো-ভালো।

—জজবাবুদের বাড়ি এসেছিলেন। তা নিধুকে খুব ভালোবাসেন কিনা তাই এখানেও এলেন। বড় ভালো লোক—

ইতিমধ্যে আরও দু-তিনটি পাড়ার ঝি-বৌ পুকুরের ঘাটে বাসন হাতে আসিলেন। সকলের মুখেই ওই এক প্রশ্ন। হাকিমদের বয়স কত? নিধুর মা কি খাইতে দিল তাহাদের ?

বুড় রায়গিন্নি বলিলেন—তা বেঁচে থাক নিধু। ওকে সবাই ভালোবাসে—অমন ছেলে গাঁয়ে নেই—

—তাই এখন বর্ল দিদি—তোমাদের আশীর্বাদে, তোমাদের মা-বাপের আশীর্বাদে নিধু এখন—

নিধুকে কিন্তু সারাদিনের মধ্যে ও-বাড়ি হইতে কেহই ডাকিতে আসিল না। বৈকালের দিকে সে নিজেই একবার মঞ্জুদের বৈঠকখানায় গিয়া খোঁজ লইয়া জানিল সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু বাড়ির মধ্যে জলযোগ করিতেছেন—এখনি রামনগরে ফিরিবেন। লালবিহারীবাবুকেও বাহিরে দেখা গেল না—সম্ভবত অন্তঃপুরে অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত আছেন।

কিছু ভালো লাগিল না। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। রামনগরের পাকা রাস্তার উপরে খানিকটা উদভ্রান্ত ভাবে পায়চারি করিতে-করিতে সে একটা সাঁকোর উপরে আসিয়া বসিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে দুখানা সাইকেলে সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু আসিতেছেন।

তাঁহারাও তাহাকে দেখিয়াছেন মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—নতুবা হয়তো গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়িত।

সুনীলবাবু কাছে আসিয়া বলিলেন—নিধিরামবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি? খুঁজলাম আপনাকে আসবার সময়, পেলাম না। আপনি কাল সকালে যাবেন?

দুজনেই সাইকেল হইতে নামিয়াছিলেন। নিধু কিছুদূর পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া আগাইয়া দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে সে বাড়ি ফিরিল। নিধুর মা বলিলেন—বিকেলবেলা কিছু খেলিনে—জজবাবুর বাড়ি খাবার খেয়েছিস বুঝি?

—হ্যাঁ।

—সে আমি তখনই বুঝেচি—তোকে না খাইয়ে কি ওরা ছাড়ে কখনো? হাকিমবাবুরা চলে গেল বুঝি?

—গেল।

এমন সময় একটা লণ্ঠনের আলো তাহাদের উঠানে পড়িল—এবং আলোর পিছনে লণ্ঠন ধরিয়া যে দুজন মেটে পাঁচিলের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিল—তাহাদের দেখিয়া নিধু বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মঞ্জু আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও জ্যাঠাইমা, কি করচেন? নিধুদা কোথায়? ওমা এই যে নিধুদা!

হতভম্ব নিধু কিছু জবাব দিবার পূর্বেই মঞ্জু বলিল—বড়দা এসেছেন, আপনাকে খুঁজচেন কখন থেকে। জ্যাঠাইমা, নিধুদা আজ রাত্রে ওখানে খাবে কিন্তু—চলুন নিধুদা—আসুন—বলিয়াই নিধুকে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই মঞ্জু ও নৃপেন তাহাকে লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। নৃপেন আগে, মঞ্জু ও নিধু পিছনে। পথে মঞ্জু বলিল—কি হয়েচে আপনার? সারাদিন দেখিনি কেন? ছিলেন কোথায়?

—বাড়িতেই ছিলাম—যাব আবার কোথায় ?

—আমাদের ওখানে যাননি যে বড় ?

—সব সময়েই যে যেতে হবে তার মানে কি ?

মঞ্জু নিধুর উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কি হয়েচে আপনার ?

—কিছুই না। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের আবার হবে কি ?

—কেন রাগ হল কেন হঠাৎ শুনি ? কি হয়েচে ?

—কিছুই না। কি আবার হবে ?

—রাগ হয়েচে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু আমি কি করব নিধুদা, বাড়িতে আজ সবাই ওদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি ওদের সামনে কবার বেরিয়েচি ? ডাকবার সুবিধে থাকলে ডাকতাম।

নিধুর রাগ নিবিয়া জল হইয়া গেল। বেচারী মঞ্জু! সে কি করিবে ?

বাড়ি ঢুকিয়া মঞ্জু মাঁকে ডাকিয়া বলিল—নিধুদা রাত্রে আমাদের এখানে খাবে বলে এসেছি মা—আজ সারাদিন আমাদের বাড়িতে আসেনি মা—এখন গিয়ে ধরে আনলাম—আসুন বড়দার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই—

পাশের ঘরে মঞ্জুর বড়দা অরুণের সঙ্গে আলাপ হইল। অরুণকে নিধুর তেমন ভালো লাগিল না। কথার মধ্যে বেশির ভাগ বাঁকা সুরে ইংরাজি বলে, ঘনঘন সিগারেট খায়—একটু নাক সিঁটকানো গর্বের ভাব কথা-বার্তার মধ্যে। অরুণের প্রতি কথায় পাড়াগাঁয়ের সব কিছুর উপর একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব বেশ সুস্পষ্ট।

—উঃ, কাল কি সোজা কষ্ট গিয়েচে এখানে পৌছুতে! বাবারও যেমন কাণ্ড। বলেছিলুম দেশে পুজো করে কি হবে ? ছুটি নিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে আছেন—তারপর যখন ম্যালেরিয়াতে ধরবে তখন বুঝবেন! বাব্বাঃ—এই জঙ্গলে মানুষ থাকে ?

—তা বটে। আমরা উপায় নেই বলে পড়ে আছি—

—আপনি বুঝি রামনগরে প্র্যাকটিস করেন? ফিল্ড কি রকম?

—আগে ভালোই ছিল। এখন দেশে নেই পয়সা—আপনিও তো ল' পড়চেন শুনলাম—

—আমি যদি বসি, আলিপুরে বেরুব। এসব জায়গায় লাইফটা নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। পয়সা পেলেও না—

—না, আপনাদের মতো লোক কেন এখানে থাকতে যাবেন?

আর আধঘণ্টা পরে মঞ্জুকে সে কিছুক্ষণের জন্য একা পাইল।

মঞ্জু বলিল—বড়দার সঙ্গে আলাপ হল? বেশ লোক বড়দা। কাল সকালে যাবেন নাকি আপনি?

—যাব না তো কি? এখানে থাকলে তো চলবে না—

—এখনো আপনার রাগ যায়নি নিধুদা—

—আমরা গরিব মানুষ, আমাদের আবার রাগ—

—ও রকম বলবেন না নিধুদা—আমার মনে কষ্ট হয় না ও'তে?

—হলে কি সারাদিন না ডেকে থাকতে পারতে?

—কিছু লাভ ছিল না ডেকে। সামনে বেরুতে পারতাম না তো?

—কেন?

—ওঁরা সব সময় ঘরের মধ্যে। অমরবাবুর সামনে আমি বেরুইনি—ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই আমার।

—আমি ভাবলুম আমাকে ওদের সামনে কি করে বার করবে ভেবে আর ডাকলে না—

—দুষ্টু বুদ্ধি আপনার হাড়ে-হাড়ে। কুটিল মন কিনা!

—সে তো জানোই—পাড়াগাঁয়ের মানুষের মন কখনো সরল হয়?

—হয়ই না তো। সেটা মিথ্যে কথা নাকি?

—তার প্রমাণ পেয়েই গেলে। হাতে-হাতেই পেলে—

—এমন আড়ি দেব আপনার সঙ্গে যে আর কখনো কথা বলব না—

—না তা করো না। লক্ষ্মীটি—তাহলে থাকতে পারব না—

—তবে! তবে ও রকম করেন কেন? এখন বলুন, আর ওসব কথা বলবেন না—

—কক্ষনো না।

—পুজোর সময় প্লে করার কি হবে?

—ঠিক করে ফেল—অরুণবাবু তো আছেন—

—বড়দা বলছিলেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' প্লে করতে—কলকাতায় সম্প্রতি হয়েচে—উনি দেখে এসেচেন—

—উনি যা বলেন। বইখানা আনতে বোলো—

—আপনি কি বলেন?

—আমি ওসবের কি জানি? আমরা জানি যাত্রার প্লে—রামনগরে উকীল-মোক্তারের একটা থিয়েটার আছে—তারা পুজোর সময় গিরিশ ঘোষের 'জনা' করবে। আমাকে পার্ট নিতে বলেচে—

—কি পার্ট নেবেন?

—তা এখনো ঠিক হয়নি—

—ভালো পার্ট করতে পারেন?

—কখনো করিনি কি করে বলি? তবে চেষ্টা করলে মন্দ হবে না—

—আমার মনে হয় খুব ভালোই হবে।

—তুমি পার্ট করবে তো?

—আমি তো স্কুলে পার্ট করে এসেছি ফি বছর। আমার অভ্যেস আছে। গান যাতে আছে এমন পার্ট আমায় দিত।

—এখানেও তাই নিতে হবে তোমায়, গান তুমি ছাড়া কে গাইবে?

—আচ্ছা, একটা কথা। পাড়াগাঁয়ে কেউ কিছু বলবে না তো?

—তোমরা করলে কেউ বলবে না। কাকাবাবুর নামে সবাই তটস্থ, অন্য কেউ হলে রক্ষে রাখত না—

—সে আমি জানি। আচ্ছা, গাঁয়ের আর কোনো মেয়ে পার্ট নিতে পারে?

—আমার তো মনে হয় না—তবে ভুবন গাঙ্গুলির এক মেয়ে এসেচে বাপের বাড়ি। বিয়ে হয়ে গিয়েচে, জামাই রেলের আফিসে ভালো চাকরি করে—তুমি ডাকিয়ে জিগগেস কোরো—ও বিয়ের আগে গোয়াড়ী গার্লস্ স্কুলে পড়ত মামারবাড়ি থেকে—সেখানে পার্ট করত—

—কি নাম? আমি তো জানিনে—কালই আলাপ করব—

—নাম হৈমবতী। এখন শুনচি নাম হয়েচে হেমপ্রভা—ও চিরকাল মামারবাড়িতে মানুষ, এখানে বড় একটা আসত না। তা ছাড়া ওর বাবাও নাকি এখানে থাকত না। যাক—সে কথা বাদ দাও মঞ্জু। ডেকে নিয়ে আসতে পার তো এস—

—তারপর সেই কাগজ বার করার কথা মনে আছে তো?

—সে তো পুজোর পর?

—না, পুজোর সময় প্রথম সংখ্যা বার করব।

—যা তোমার ইচ্ছে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

—মনের কথা বলচেন নিধুদা?

—মনের কথা নিশ্চয়ই। বিশ্বাস কর মঞ্জু।

রাত্রে আহারাদির পরে নিধু চলিয়া আসিল।

আসিবার সময় মঞ্জু দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—সামনের শনিবারে আসবেন তো?

—কেন আসব না?

—না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি দেব—

—দেখ আসি কিনা।

সারা সপ্তাহ ধরিয়া নিধু একটি পয়সা রোজগার করিতে পারিল না। মক্কেলের যেন দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গিয়াছে—সকাল হইতে তীর্থের কাকের মতন বাসায় বসিয়া ঘন-ঘন হাই তুলিয়া ও বাহিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া নিধুর মোক্তারী ব্যবসাটার উপরই অশ্রদ্ধা ধরিয়া গেল। নিধুর মুহুরী বলে—বাবু, এ হপ্তাটায় হল কি? মক্কেলের যেন আকাল পড়েচে দেখচি—

—চল কোর্টে আসতে পারে।

কিন্তু কোর্টেও কেহ আসে না। যতু-মোক্তার একদিন বলিলেন—ওহে সুনীলবাবুর কোর্টে তো তোমার খাতির আছে এই জামিনের জন্যে মুভ্ করে জামিনটা করিয়ে দাও না?

নিধু কেস শুনিয়া বুঝিল এ ক্ষেত্রে জামিন হওয়া অসম্ভব। বাড়িতে চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে—পুলিশ যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে—তাহার গতিকও খুব খারাপ। যতু-মোক্তার নিজের নাম খারাপ করিতে রাজী নন, তিনি খুব ভালোই জানেন কোর্ট জামিন দিতে রাজী হইবে না। খাতিরে পড়িয়া যদি সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করেন—ইহাই যতুবাবুর ভরসা।

সে বলিল—কাকাবাবু, এ আমার দ্বারা সুবিধে হবে না—

—কেন হবে না? যাও না একবার—

—মাপ করুন কাকাবাবু, সুনীলবাবু কি মনে করবেন?

—চেষ্টা করতে দোষ কি? যাও একবার—

যতুবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিধু গিয়া জামিনের দরখাস্ত দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিল।

সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করিলেন।

মক্কেল নিধুকে দুইটি টাকা দিল। নিধু সে দুটি টাকা লইয়া গিয়া যতুবাবুর

হাতে দিতে তিনি কোনো কথা না বলিয়া তাহা পকেটস্থ করিলেন—কারণ মক্কেল আসলে তাঁহার। অবশ্য জামিননামার টাকাটা নিধু পাইল।

বাসায় আসিয়া সে দেখিল সাধন-মোক্তার তাহার জন্য রোয়াকে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সাধন বলিলেন—তোমার জন্যে বসে আছি হে নিধিরাম—

— আজ্ঞে, বসুন-বসুন। বড় কষ্ট হয়েছে?

— কিছু কষ্ট নয়। তুমি জামা কাপড় ছেড়ে সুস্থ হও—আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেচি। ওবেলা তোমার কেসটা বেশ ভালো হয়েচে—কিন্তু যদু-দা নাকি তোমায় টাকা দেননি?

— কে বললে আপনাকে?

—আমি সব জানি হে—আমার কাছে কি লুকোনো থাকে কিছু? তাই কিনা?

—আজ্ঞে না, তা নয়। তবে ওঁরই মক্কেল—

—কিসে ওঁর মক্কেল? তুমি জামিনের দরখাস্ত দিয়ে জামিন মুভ্ করে জিতলে—তবে ওঁর মক্কেল হল কি করে? মক্কেলের গায়ে লেখা আছে নাকি কার মক্কেল?

—আজ্ঞে ওঁর কাছেই প্রথম তারা গিয়েছিল, আমার কাছে তো আসেনি? তাই—

—তবেই ওঁর মক্কেল হয়ে গেল? অত সূক্ষ্ম ওজন জ্ঞান করে মোক্তারী ব্যবসা চলে না ভায়া। হরি আমায় বলছিল, যদুদার আক্কেলটা দেখলে? ছোকরা জামিন মঞ্জুর করিয়ে দিলে—আর যদুদা দিব্যি টাকাটা গাপ করে ফেললে বেমালুম। ঘোর কলি! আমার পরামর্শ শোনো আমি বলি—

—আজ্ঞে কি?

—সুনীলবাবুর কোর্টে তোমার খাতির হয়ে গিয়েচে সবাই জানে।

ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েচে। তুমি এখন যদুদার হাত থেকে কেস পেলেও ফি-এর টাকা তাঁকে দিও না। যদুদা চিরকাল ওই করে এলেন - যার সঙ্গে যার খাতির, তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে নাম কেনেন নিজে।

নিধিরাম দেখিল সাধন-মোক্তারের কথায় সামান্য মাত্র সায় দিলেও আর রক্ষা নাই—ইনি গিয়া এ কথা অন্য কোথাও গল্প করিবেন। সে ব্যক্তি যদুবাবুর কানে কথা উঠাইলে তাহার উপর যদুবাবু চটিয়া যাইবেন। তাহার ব্যবসার প্রথম দিকে তাঁহার মতো প্রধান মোক্তারের সাহায্য ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলে নিজের সমূহ ক্ষতি।

সে একটু বেশ জোরের সঙ্গেই বলিল—না সাধনবাবু—আমি তা মনে করি না। যদুবাবু খুব বিচক্ষণ মোক্তার—সত্যিকার কাজের লোক। আমার তিনি পিতৃবন্ধু—আমায় ছেলের মতো দেখেন!

সাধন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন—ছেলের মতন দেখেন—তা তো বেশ বোঝাই গেল। মুখে ছেলের মতন দেখি বললেই তো হয় না—সে রকম দেখাতে হয়—দুটো টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না—ছেলের মতো দেখেন!

—যাক ও নিয়ে আর—

—তুমি আমার দুটো মক্কেলের কেস কাল নাও না? আমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক তোমায় দেব। করবে?

—কেন করব না বলুন! দেবেন আপনি—

নিধু একটু আশ্চর্য হইয়া গেল যে সাধন এবার তাহাকে বিবাহ সংক্রান্ত কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হঠাৎ সাধন বলিলেন—হ্যাঁ হে সেদিন ওঁরা বুঝি তোমার বাড়িতে—

—আমার বাড়ি কোথায়? লালবিহারীবাবু মুন্সেফ আছেন আমার প্রতিবেশী—তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

—তুমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাতির করেছিলে তো ?

—হ্যাঁ তা অবিশ্যি সামান্য—আমার আর কি ক্ষমতা—

—বেশ ! বেশ ! সেই কথাই বলচি—ভালো কথাই তো। তোমার সঙ্গে সুনীলবাবুর বেশ আলাপ হয়ে গিয়েচে, একথা শুনে অনেকেরই খুব হিংসে তোমার ওপর জানো তো ?

নিধু আশ্চর্য হইয়া বলিল—সে কি ! এর জন্যে কিসের হিংসে ?

—তুমি কেন হাকিমদের সঙ্গে আলাপ করবে, বাড়ি নিয়ে যাবে—যখন বারে এত প্রবীণ মোক্তার রয়েচে—কই আর কারো বাড়ি তো হাকিম যায়নি ?

—এসব নিয়ে কথাবার্তা হয় নাকি ?

—তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে বারের প্রবীণ মোক্তারেরা পর্যন্ত এই নিয়ে বলাবলি করেচে। সবারই হিংসে।

—করুক গিয়ে। ভালোই তো আমার একটু পসার হবে হয়তো ওতে।

—না ভায়া—মক্কেল ভাঙিয়ে নিতেও পারে। হিংসে করে যদি তোমার পেছনে সবাই লাগে—তবে তোমার মক্কেল পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমার হিতৈষী বলেই তোমায় বলে গেলাম।

সাধন কি মতলবে আসিয়াছিল নিধু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল সাধনের কথার মূলে হয়তো সত্য আছে। বার-লাইব্রেরী সুদ্ধ সব মোক্তার তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল নাকি ? নতুবা সারা সপ্তাহে সে একটি পয়সা পাইল না কেন ?

শনিবার দিন সকালে বাড়িওয়ালার লোক ও গোয়ালা আসিয়া তাগাদা দিল। নিধু তাহাদের বুঝাইয়া দিল এ চাকুরি নয় যে মাসকাবারে মাহিনা হাতে আসে—টাকা দিতে দু-চার দিন বিলম্ব হইবে। কিন্তু বাড়িওয়ালার লোক যেন তাড়াইল—বাড়িতে আজ যাইবার সময় জিনিসপত্র সওদা

করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—হাতে এদিকে একটি পয়সা নাই। তাহার আয়ের উপরই আজকাল সংসার চলে—খরচ দিয়া না আসিলে পরবর্তী সপ্তাহে সংসার অচল।

নিধুর মুহুরী এই সময় আসিয়া বলিল—বাবু আজ বাড়ি যাবেন ?

—তাই ভাবচি। কি নিয়ে যাই, একটা পয়সা তো নেই হাতে—

—মোক্তারী ব্যবসার এই মজা। মাঝে-মাঝে এমন হবেই বাবু। মক্কেল কি সব সময়ে জোটে ? যদুবাবুর কাছে একবার যান না ?

—কোথাও যাব না। ওতে আরো ছোট হয়ে যেতে হয়। না হয় আজ বাড়ি যাব না, সেও ভালো।

শুধু সে শনিবার নয়, পরের শনিবারেও নিধুর বাড়ি যাওয়া হইল না। মক্কেলের দেখা নাই আদৌ, মুদী ধারে জিনিসপত্র দেয়, তাই বাসাখরচ একরূপ চলিল, কিন্তু অন্যান্য পাওনাদারের তাগাদায় নিধু অস্থির হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে বাড়ি হইতে বাবার চিঠি পাইল—শনিবার বাড়ি কেন আসে নাই—সংসারে খুব কষ্ট যাইতেছে—বাড়ি সুদ্ধ লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে যদি সে সামনের শনিবারে না আসে—আসিবার সময় যেন হেন আনে তেন আনে—জিনিসপত্রের একটা লম্বা ফর্দ পত্রের শেষে জুড়িয়া দেওয়া আছে। চিঠিখানা ছাড়া হইয়াছে শুক্রবার—রবিবার সকালে সে চিঠি পাইল। সে সম্পূর্ণ নিরুপায়—হাতে পয়সা না আসিলে বাড়ি গিয়া লাভ কি ?

সোমবার সে কি কাজে একবার সুনীলবাবুর কোর্টে গিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবু, আপনি এ শনিবারে বাড়ি যাননি তো !

—না, একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—আমি গিয়ে আপনাকে কত খুঁজলাম, তা সবাই বললে আপনি যাননি।

—ও! আপনি গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—আমি গিয়েছিলাম মানে যাবার জন্যে বিশেষ করে পত্র দিয়েছিলেন পিসিমা—মানে লালবিহারীবাবুর স্ত্রী - আমাদের এক পাড়ার মেয়ে কিনা।

—ও! আপনি একা গিয়েছিলেন?

—এবার একাই। সেই জন্যেই তো বিশেষ করে আপনার খোঁজ করলাম। কার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলি। লালবিহারীবাবু প্রবীণ লোক—তাঁর সঙ্গে কতক্ষণ গল্প বলা যাবে আপনি যে যাবেন না—আমার সে কথা মনেই হয়নি। আপনিও তো গত সপ্তাহে আমার কোর্টে একদিনও আসেননি কিনা।

নিধু মনে-মনে ভাবিল – কেস থাকিলে তো কোর্টে আসিবে। মক্কেল নামক জীব হঠাৎ পৃথিবীতে যে কত দুর্লভ-দর্শন হইয়া উঠিয়াছে—তাহার খবর হাকিমের চেয়ারে বসিয়া কি করিয়া রাখিবেন আপনি?

মুখে বলিল – আজ্ঞে হ্যা—আমিও যদি জানতাম আপনি যাচ্ছেন, তাহলে নিশ্চয়ই যেতাম। তা তো জানি না—

সন্ধ্যার সময় সুনীলবাবুর আরদালি আসিয়া নিধুর হাতে একখানি চিঠি দিল—বিশেষ দরকার, নিধিরামবাবু কি দয়া করিয়া একবার তাঁহার বাসার দিকে আসিতে পারেন?

নিধু গিয়া দেখিল বাহিরের ঘরে একা সুনীলবাবুই বসিয়া আছেন—মুন্সেফবাবু এসময় এখানে বসিয়া আড্ডা দেন, আজ তিনি আসেন নাই। নিধুকে দেখিয়া সুনীলবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—সেদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে আদর যত্নে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। বসুন—

নিধু লজ্জিত মুখে বলিল—আমাদের আবার আদর যত্ন! আপনাদের মতো লোককে কি আমরা উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করতে পারি? সামান্য অবস্থার মানুষ আমরা—

—ও সব বলবেন না নিধিরামবাবু। ওতে মনে কষ্ট পাই—বসুন, আমি দেখি চায়ের কি হল—আপনার সঙ্গে খাব বলে বসে আছি—আপনি চা খান না বুঝি আবার? একটু মিষ্টি-মুখ করে—

চা ও জলযোগ পর্ব চুকিয়া গেলে সুনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

নিধু একটু বিস্মিত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। তাহার মতো লোকের সঙ্গে কি কথা আছে একটা মহকুমার সেকেণ্ড অফিসারের, সে ভাবিয়াই পাইল না।

—লালবিহারীবাবুকে আপনি তো ভালো করেই জানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি বৈকি! এক গাঁয়ের লোক। তবে উনি এবার অনেকদিন পরে গাঁয়ে এলেন। একবার দেখেছিলাম ছেলেবেলায়—আর এই দেখলাম এবার—বাবার সঙ্গে খুব আলাপ—

—তা তো হবেই। আপনার বাবাকে এ রবিবারেও দেখলাম লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানাতেই। ওঁরা সমবয়সী প্রায়—

—ঠিক সমবয়সী নয়, বাবার বয়েস বেশি।

—আচ্ছা, আপনি লালবিহারীবাবুর মেয়ে মঞ্জরীকে দেখেচেন তো?

নিধু প্রায় চমকাইয়া উঠিয়া সুনীলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—মঞ্জরী?—ও মঞ্জু? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে দেখেচি বই কি, তা—

সুনীলবাবু সম্ভবত নিধুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না। তিনি সহজ সুরেই বলিলেন—তাকে দেখেচেন তাহলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—দেখেচি বই কি। কেন বলুন তো?

সুনীলবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—সেদিন লালবিহারীবাবু ওর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলেন কিনা। তাই বলচি।

—কার বিবাহ?

—মানে আমার সঙ্গেই।

—ও!

—আপনি কি রকম মনে করেন? মেয়েটি ভালোই কি বলেন? আপনাদের গাঁয়ের মেয়ে তাই জিগগেস কচ্চি।

—ইয়ে—হ্যাঁ—ভালো বৈকি। বেশ ভালো।

—অবিশ্যি আমার মতে হবে না। আমার বাবা কর্তা, তাঁকে জিগগেস না করে কোনো কাজ হতে পারে না। তাঁরা মেয়েটি দেখেচেন কারণ একই পাড়ায় ওর মামারবাড়ি, সেখানে থেকে স্কুলে পড়ে। আমাদের বাড়িও ওদের যাতায়াত আছে—তবে আমি কখনো দেখিনি—কারণ আমি থাকি বিদেশে। কলকাতায় থাকি আর কদিন?

—কেন রবিবারে তাকে দেখলেন না?

—ঠিক মেয়ে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া বাবা মেয়ে না দেখে গেলে আমার দেখায় কিছু হবেও না। তবুও ওঁরা একবার মেয়েটিকে দেখাতে চাইলেন তাই দেখলাম। দেখতে ভালোই অবিশ্যি—সে আমি আগেও শুনেছিলুন। কিন্তু শুধু বাইরে দেখে—

নিধুর মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, একথার উত্তর তাহার দেওয়া উচিত। মঞ্জুকে সে সব সময় সর্বত্র বড় করিয়াই রাখিতে চায়। কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে ছোট ধারণা না হয়, এটা দেখা তাহার সর্বপ্রথম কর্তব্য। সুতরাং সে বলিল—আজ্ঞে না শুধু বাইরে নয়—মেয়েটি সত্যিই ভালো।

সুনীলবাবু একটু আগ্রহের সুরে বলিলেন—আপনার তাই মনে হয়?

—আমার কেন শুধু, আমাদের গ্রামের সকলেরই তাই মত।

সত্যিই ওরকম মেয়ে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না—

—বেশ, বেশ। আপনার মুখে একথা শুনে খুব খুশি হলাম। দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না—যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে—তাকে অন্তত একটু যাচাই না করে নিয়ে—আমার অন্তত তাই মত। বাবা যা দেখবেন, সে তো দেখবেনই।

নিধু একথায় বিশেষ কোনো জবাব দিল না।

নিধুর মনের মধ্যে কেমন এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা। সুনীলবাবুর শেষ কথাটা তাহার কানে যেন অনবরত বাজিতেছিল—সারাজীবন মঞ্জুর সঙ্গে থাকিবেন কে? না সুনীলবাবু।

মঞ্জু সুনীলবাবুর জীবনসঙ্গিনী?

বাসায় ফিরিবার পথে সুনীলবাবু তাহার সহিত গল্প করিতে-করিতে খানিক দূর পথ আসিলেন। শুধু মঞ্জুর সম্বন্ধেই কথা। নানা ধরনের আগ্রহভরা প্রশ্ন, কখনো খোলাখুলি, কখনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য নিধুর কাছে ঠিক বোধগম্য হইল না।

—আচ্ছা, নিধিরামবাবু, মঞ্জু কিরকম লেখাপড়া জানে বলে আপনার মনে হয়?

—বেশ জানে। এবার তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠবে—

—আমি তা বলচি নে—পড়াশুনোতে কেমন বলে মনে হয় আপনার? বেশ কালচার্ড?

—নিশ্চয়ই। হাতের লেখা কাগজ বার করবে শিগগির। লেখাটেখার ঝোঁক আছে, গান করে ভালো—

—গান শুনেচেন আপনি?

এখানে কি ভাবিয়া নিধু সত্যকথা বলিল না। তাহার সামনে বসিয়া মঞ্জু গান গাহিয়াছে, এ কথা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই, না বলাই ভালো।

সে বলিল—কেন শুনব না। দেখেচেন তো আমাদের বাড়ির সামনেই ওদের বাড়ি। মাঝে-মাঝে গান করে ওদের বাড়িতে, আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যায় বই কি।

মোটের উপর নিধুর মনে হইল মঞ্জুকে দেখিয়া সুনীলবাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুর চিন্তাই এখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান—ইহার প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা সবই এখন রূপমুগ্ধ তরুণ প্রেমিকের প্রলাপের পর্যায়ভুক্ত।

বাসায় আসিয়া নিধু মোটেই স্থির হইতে পারিল না। মনের সেই যন্ত্রণাটা যেন বড় বাড়িয়াছে। মঞ্জু সুনীলবাবুর সারাজীবনের সাথী হইবে—একথা যেন সে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

সেদিন আর রাঁধিল না। চাকর জিজ্ঞাসা করিল—কি খাওয়ার যোগাড় করে দেব বাবু?

—তুই দুটো পয়সা নিয়ে গিয়ে বরং চিঁড়ে কিনে আন—তাই খাব এখন। শরীর ভালো নয়, রান্না আজ পারব না।

—সে কি বাবু? চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাবেন কেন? আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—

—না, না—তুই যা এখন। আমার শরীর ভালো না—আর কিছু খাব না।

আহারাদির পরে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত প্রায় একটা। নিধু দেখিল সে মাথামুণ্ড কি যে ভাবিতেছে! নানা অদ্ভুত চিন্তা। জীবনে সে কখনো এরকম ভাবে নাই।

গভীর রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল হইল। আচ্ছা, সে এত রাত পর্যন্ত কি ভাবিয়া মরিতেছে? কেন তাহার চক্ষে ঘুম নাই? মঞ্জু যাহারই জীবনের সাথী হউক—তাহার তাহাতে আসে যায় কি?

আজ একটি সপ্তাহের মধ্যে যে একটি পয়সা আয় করিতে পারে নাই—

তাহার পক্ষে মঞ্জুর চিন্তা করাও অন্যায়। কখনো কি সম্ভব হইবে মঞ্জুকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করিবার ?

আকাশকুসুমের আশা ত্যাগ করাই ভালো।

মঞ্জুর বাপ-মা তাহার সঙ্গে কখনো কি মঞ্জুর বিবাহ দিবেন বলিয়া সে ভাবিয়াছিল ? সে নিজের মনের মধ্যে ডুবিয়া দেখিল এমন কোনো দুরাশা তাহার মনে কোনোদিনই জাগে নাই। তবে আজ কেন সে সুনীলবাবুর কথায় এত বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ? মঞ্জুর সঙ্গে মুখের আলাপ আছে মাত্র। ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়।

অপর পক্ষে মঞ্জু বড়মানুষের মেয়ে—সে লালিত হইয়াছে সচ্ছলতার মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যে, অন্য ধরনের জীবনের মধ্যে। সুনীলবাবুর সঙ্গে বিবাহ হইলে মঞ্জু জল হইতে ডাঙায় পড়িবে না—নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই সে থাকিতে পারিবে। চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রায় জোর করিয়া পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে না।

সুনীলবাবুর ঘরে সে মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী রূপে—

না, কথাটা ভাবিতে গেলে আবার যেন বুকের মধ্যে কোথায় খচ করিয়া বাজে।

পরদিন সকালে জন দুই মক্কেল আসিল। ধানের জমি লইয়া মারপিটের মোকর্দমা, তবে নিধুর মনে হইল ইহারা যাচাই করিয়া বেড়াইতেছে কোন মোক্তারের কত দর—শেষ পর্যন্ত যদুবাবুর কাছে গিয়াই ভিড়িবে।

নিধু নিজের দর কিছুমাত্র কমাইল না—কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিল লোক দুটি তাহাকেই মোক্তার নিযুক্ত করিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তাহাদের লইয়া ব্যস্ত থাকিবার পর নিধু বলিল—তোমরা যাও বাজার থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে এস—প্রথম কাছারীতেই তোমাদের মোকর্দমা রুজু করে দেব—আমার টাকা আর কোর্টের খরচটা দিয়ে যাও—

—কত ট্যাকা বাবু?

—এই যে বললাম সবসুদ্ধ চারটাকা সাড়ে ন' আনা—

—বাবু, ট্যাকা কাছারীতেই দেবানু—

—না বাপু, ও সব দেবানু-টেবানু শুনচিনে—টাকা দিয়ে যাও—ডেমি কিনতে হবে, আর্জির স্ট্যাম্প কিনতে হবে—সে সব কে কিনবে ঘরের পয়সা দিয়ে?

—বাবু, এখন তো মোঁদের কাছে নেই—

—কাছে নেই তো মোকদ্দমা করতে এসেচ কেন মরতে? জানো না যে রামনগরে এলেই পয়সা সঙ্গে করে আনতে হয়?—

—তবে বাবু যদি আপনি একটা ঘণ্টা সময় দেন—প্রথম কাছারীতেই মোরা ট্যাকা দেবানু ট্যাকা না পেলে আপনি মোদের মোকর্দমা করবেন না—

ইহারা চলিয়া কিছুদূর যাইবার পরেই আরও জন চারেক মক্কেল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের সহিত কথা কহিয়া নিধু বুঝিল—ইহারা পূর্বের মারপিটের মোকর্দমারই ফরিয়াদী পক্ষ। ইহারাই মার খাইয়াছে। এক-জন প্রহৃত ব্যক্তি মাথায় লাঠির দাগ সমেত আসিয়াছে।

ইহাদের মোড়ল বলিল—বাবু, আমাদের হক মোকর্দমা—মাথায় এই দেখুন লাঠির দাগ—ট্যাকা যা লাগে আপনাকে দেবানু—এখুনি এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনি—মোকর্দমার এজাহারটা করিয়ে দিন—

যদিও ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া নিধুর মনে হইল ইহারাই ঠিক কথা বলিতেছে—টাকাও দিতে এখুনি প্রস্তুত—তবুও নিধু দুঃখিতচিত্তে বলিল

—বাপু, আমি অপর পক্ষের কেস নিয়ে ফেলেচি—তোমাদেরটা নিতে পারব না—

—বাবু, আপনি যা লাগে নেন মোদের কাছ থে। ক-ট্যাকা দিতে হবে

বলুন আপনারে মোরা দিয়ে যাই। মোদের গাঁয়ের একটা মোকর্দমায় আপনি জামিন করিয়ে দিয়েছিলেন—বড্ড সুখ্যাতি পড়ে গিয়েচে। মোক্তার যদি দিতে হয় তবে আপনারেই দেব –

—না, সে হবে না। আমি তাদের কথা দিয়েচি—

নিধুর মুহুরী নিধুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিল—নিয়ে ফেলুন ওদের কেস বাবু, মনে হল পয়সা দেবে - পয়সা হাতে আছে এদের। অপরপক্ষ তো আপনাকে টাকা দেয়নি তবে কিসের বাধ্য-বাধকতা তাদের সঙ্গে ?

—না হে, যখন কথা দিয়ে ফেলেচি, কেস নেব বলেচি—তখন কি আর টাকার লোভে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ানো চলে ?

—টাকা পেলে না হয় সে কথা বলতে পারতেন বাবু—কিন্তু টাকা তো আপনি হাত পেতে নেননি তাদের কাছে ?

—ও একটা কথা হে। মুখের কথা টাকার চেয়েও বড়—

—বাবু, এ মহকুমায় এমন কোনো উকিল-মোক্তার নেই যিনি এমনধারা করেন। মক্কেল টাকা দিলে না তো কিসের মক্কেল ?

—না সে আমার দ্বারা হবে না। অপরে যা করেন, তাঁদের খুশি। আমি তা করতে পারব না—

অগত্যা ইহারা চলিয়া গেল। কিন্তু কোর্টে গিয়া নিধু সবিস্ময়ে শুনিল ধরণী-মোক্তার পূর্বপক্ষের মোকর্দমা রুজু করিতে সুনীল বাবুর কোর্টে ছুটিতেছেন।

নিধুর মুহুরীই বলিল—দেখলেন বাবু, বললাম তখন আপনাকে। ধরণী-বাবুকে ওরা মোক্তার দিয়েচে—আপনার কাছে যাচাই করতে এসেছিল—টাকার কথা বলতেই পিছিয়ে পড়েচে—

—এ তো ভারি অন্যায় কথা! ধরণীবাবুই বা আমার কেস নিতে গেলেন কেন ?

—ওরা তো ধরণীবাবুকে আপনার কথা কিছু বলেনি ? তিনি হয়তো কম টাকাতে রাজী হয়েচেন—

—ওদের একজনকে আমার কাছে ডেকে আনতে পার ?

—তারা বাবু আসবে না। আমি কত খোশামোদ করলাম ওদের। ধরণীবাবু মোক্তারনামায় সই করেচেন—তাঁর মুহুরী ডেমি লিখে ফেলেচে—

—এ পক্ষ ?

—তারা যদুবাবুকে মোক্তার দিয়েচে। যদুবাবু সাবডেপুটি বাবুর এজলাসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মক্কেল নিয়ে—

—এ কিরকম ব্যাপার হল হে ?

—এই রকমই হয় এখানে। আপনি নতুন লোক, এসব জানবেন কোথা থেকে ? তাইতো তখন আপনাকে বললাম ওদের টাকা নিয়ে ফেলুন—

—টাকার জন্যে একটা অন্যায় কাজ আমি তো করতে পারিনে ? তাহলেও ধরণীবাবুকে আমি একবার বলব—

—বলবেন না বাবু, তাতে উল্টে ধরণীবাবু ভাববেন মক্কেলের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে। সেটা বড় খারাপ দেখাবে। ধরণীবাবুর তো কোনো দোষ নেই—তিনি না জেনেই কেস নিয়েচেন। আমার কথাটা শুনবেন বাবু, এই কাজ করে-করে আমার মাথার চুল পেকে গেল—এখানে মোক্তারে-মোক্তারে কম্‌পিটিশন্—উকিলে-উকিলে কম্‌পিটিশন্—যিনি যত কম হাঁকবেন, টাকা বাকি রাখবেন, তাঁর কাছে তত মক্কেল যাবে।

—তাহলে তুমি কি ভাব না যে ধরণীবাবু আমার মক্কেল ভাঙিয়ে নিয়েচেন ?

—মোক্তারনামায় সই যখন করেননি, টাকা তারা যখন দেয়নি—শুধু মুখের কথায় কি কেউ কারো মক্কেল হয় বাবু ? আপনি মুখের কথার দাম দিলেন, আর কেউ যদি না দেয় ? সবাই কি আপনার মতো ? সত্যি কথায়

এসব লাইনে কাজ হবে না বাবু সে আপনাকে আমি আগেই বলেচি। মফস্বলে সর্বত্রই এই অবস্থা দেখবেন।

বারের মধ্যে নিধুর বয়সী আর একজন ছোকরা মোক্তার ছিল। তাহার নাম নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—সেও নিধুর মতোই গরিব গৃহস্থ পরিবারের ছেলে—নিধু তবুও কিছু-কিছু উপার্জন করিত—সে বেচারীর অদৃষ্টে তাহাও জুটিত না—বেচারী তাহার মাসীমার বাড়ি থাকিয়া মোক্তারী করে বলিয়া অনাহারের কষ্টটা ভোগ করিতে হয় না—কিন্তু কিছু করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মন বড় খারাপ। নিধুর কাছে মাঝে-মাঝে সে মনের কথা বলিত। নিধুর মনে খুব দুঃখ হইয়াছিল এই ব্যাপারে—সে নিরঞ্জনের কাছে ঘটনাটি সব বলিল।

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—তোমার মতো লোকের মোক্তারী করতে আসা উচিত হয়নি নিধিরাম—

—কেন হে? কি দেখলে আমার অনুপযুক্ততা?

—এত সরল হলে এ ব্যবসা চলে? যে কোনো ঘুঘু মোক্তার হলে কৌশলে তার কাছে টাকা বার করে নিতো।

—আমি ভেবেচি যতুকাকাকে কথাটা বলব। তিনি কেন আমার মক্কেল নিলেন?

—তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্চে হে! ছেলেমানুষের মতো কথা বলচ যে। একথার মানে হয়? মক্কেলের গায়ে কি নামের ছাপ আছে নাকি? শোনো আমার পরামর্শ। যতুবাবু তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে মিথ্যে চটিও না। তুমি তবুও কিছু-কিছু পাও—আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো তো? মাসীমার বাড়ি না থাকলে না খেয়ে মরতে হত—

—আর ব্যবসা চলে না—অচল হয়েচে ভাই। এক পয়সা আয় নেই আজ দু-হপ্তা—

—দু-হপ্তা তো ভালো। আমি তোমার এক বছর আগে বসেচি, এ পর্যন্ত তেত্রিশ টাকা মোট উপার্জন হয়েচে। তবুও ভাবচি, ভবিষ্যতে হতে পারে—নইলে কোথায় যাব?

—বুড়গুলো না ম'লে আমাদের কিছু হবে না। যদুবাবু, ধরণীবাবু, শিব ভট্‌চাজ, হরিহর নন্দী—এগুলো পলাশীর যুদ্ধের বছর জন্মে আজও বার জুড়ে বসে আছে। এরা সরলে তবে যদি আমাদের—তা সবাই অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে এসেচে—

—সেই ভরসাতেই থাক—ওহে, একটা কথা শুনেছ?

—কি?

—সাধনবাবু নাকি ওর ভাইঝির সঙ্গে সাবডেপুটিবাবুর বিয়ের চেষ্টা করচে—

নিধু আশ্চর্য হইয়া বলিল—সে কি!

নিরঞ্জন হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সে বড় মজা। সাধন-মোক্তার আর তার মামা দুর্গাপদ ডাক্তার দুজনে গিয়ে আজ সকালে সুনীলবাবুর বাসায় খুব ধরাধরি করেচে—আজ ওবেলা বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করেচে—উদ্দেশ্য মেয়ে দেখানো।

—তুমি জানলে কি করে?

—দুর্গাপদ ডাক্তারের ছেলে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, সে বলছিল—সে আবার একটু বোকা মতো, তার বিশ্বাস এ বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়ে নাকি ভালো।

নিধু আপন মনেই বলিল—ও তাই!

—তাই কি?

—কিছু না এমনি বলচি—

—আমি একটা কথা বলি শোনো। সিরিয়াসলি বলচি। তুমি বার ছেড় না, তোমার হবে। তোমার মধ্যে ধর্মজ্ঞান আছে, তোমার ধরনের মোক্তার

বারে নেই। বুড়গুলো সব বদমাইস, স্বার্থপর। তোমার অনেষ্টি আছে, বুদ্ধিও আছে, তুমি এরপরে নাম করবে, তোমার গুণ বেশিদিন চাপা থাকবে না।

—বই নেই যে ?

—বরাত ভাই, সব বরাত—নইলে সি. ডবলিউ. এন. আর. সি. এল. জে-র লাইব্রেরী নিয়ে বসে থাকলেও কিছু হয় না। যদুবাবু বা হরিহর নন্দী এরা ইংরিজি পড়ে বুঝতে পারে না, সেকালের ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার—ওদের হচ্চে কি করে ? তবে আমাকে বোধ হয় শিগগির ছাড়তে হবে—

—ছাড়বে কেন ? বুড়গুলো মরুক—অপেক্ষা কর—

—ততদিনে আমার বাড়ির সব না খেয়ে মরে যাবে—বিষয় সম্পত্তি বেচে চলচে এখন—

—যদুকাকাকে বলে তোমায় দুচারটে জামিননামা দেব—জামিনের ফি'টা পাবে এখন।

—তোমার নিজের পেলে তাতে উপকার হবে—তুমি আমায় দেবে কেন ?

—যদি আমি দিই—

—সেই জন্যেই তো বলচি। তোমার মতো অনেস্ট লোক বারে আসেনি—অন্তত রামনগরের বারে। তুমি অনেক দূর যাবে—

নিধু বাসায় আসিবার পথে সাধন-মোক্তারের কাণ্ডটা ভাবিয়া আপন মনেই হাসিল। তাই আজকাল তাহার সঙ্গে এতবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের কথা একবারও মুখে আনে না—এমন বড় গাছে বাসা বাঁধিবার দুরাশায় তাহার মতো নগণ্য জুনিয়ার মোক্তারের কথা ভুলিয়াই গেল বেমালুম। ভালোই হইয়াছে—নতুবা একে পয়সার টানাটানি—তাহার উপর সাধন-বুড়োর বিবাহের ঘটকালির উৎপীড়নে ও তাগাদায় তাহাকে রামনগর ছাড়িয়া পলাইতে হইত এতদিন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিও ক্রমে কাটিয়া আসিল। একটি মক্কেলও আসিল না।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ। পূজা আসিয়া পড়িল। রামনগরের পূজা-কমিটি দুদিন মিটিং করিল, তাহার পাঁচ টাকা চাঁদা ধরিয়াছে—তাহার নামে চিঠিও আসিয়াছে। এদিকে বাড়িওয়ালা তাগাদার উপর তাগাদা করিয়া হয়রান হইয়া গেল—এখনও ভদ্রতা দেখাইয়া চলিতেছে বটে—কিন্তু পূজার ছুটির আগেও যদি টাকা না দিতে পারে—তবে হয়তো বাড়ি ছাড়িবার নোটিশ আসিয়া হাজির হইবে একদিন।

শনিবার।

আগের দিন যদু-মোক্তারের অনুগ্রহে একটা জামিনের ফি পাওয়া গিয়াছে—আরও অন্তত দুটি টাকা হইলে আজ বাড়ি যাওয়া চলে। নইলে শুধুহাতে বাড়ি গিয়া লাভ কি?

বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া-বসিয়া নিধু ফন্দি আঁটিতেছে—কি উপায়ে তাহার মুহুরীর কাছে দুটি টাকা ধার লওয়া যায়—কারণ নিধুর অপেক্ষা তাহার মুহুরীর অবস্থা ভালো—বাড়িতে জায়গা জমি, চাষবাস—এখানেও তাহার দাদা স্ট্যাম্পভেণ্ডারি করিয়া এই কোর্টের প্রাঙ্গন হইতেই মাসে দেড়শো-দুশো টাকা রোজগার করে—দুটি টাকা দিতে তাহার কষ্ট হইবার কথা নয়—কিন্তু বাবু হইয়া ভৃত্যের কাছে সোজাসুজি টাকা ধার করা চলিবে না—কোনো একটা কৌশল খাটাইতে হইবে।

এমন সময় সাধন-মোক্তার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন—এই যে নিধু বসে আছ! ওহে একটা জামিনের দরখাস্ত মুভ করবে? তিনটে টাকা পাবে যদি মঞ্জুর করে দিতে পার। মক্কেলের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেচি।

ছেলে আসামী, বাপ টাকা দিয়ে কেস চালাচ্চে, টাকা নির্ঘাত আদায় হবে। নিধু নির্বোধ নয়—সাধন-মোক্তারের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝিয়া ফেলিল। বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার কোর্টের কেস?

—সাবডেপুটির কোর্টে।

এই কথাই নিধু ভাবিয়াছিল। শক্ত কেসের আসামী, জামিন সহজে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা কম, সুনীলবাবুর সঙ্গে আজকাল নিধুর খাতির জমিতেছে একথা বারে রাষ্ট্র হইতে দেরি হয় নাই। তাহার খাতিরের চাপে যদি জামিন মঞ্জুর হইয়া যায়—জামিননামা সই করিয়া শতকরা সাড়ে বারোটাকা জামিনের ফি মারিবেন সাধন-মোক্তার।

সে বলিল—কত টাকার জামিন হবে মনে হয়?

—যা মঞ্জুর করাতে পার—পাঁচশো টাকার কম হবে বলে মনে হয় না।

অনেকগুলি টাকা জামিনের ফি। সাধন মোক্তার তাহাকে ভাগ দিবে না বা তাহার চাওয়াও উচিত নয়—তবে সে যদি জামিন মঞ্জুর করাইতে পারে—সে নিজেই জামিন দাঁড়াইবে না কেন? কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল। সাধন বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—তুমি জামিন দাঁড়াবে অত টাকার? বড্ড রিস্ক। তারপর ধর যদি পালিয়ে-টালিয়ে যায়—বেলবণ্ড বাজেয়াপ্ত হল অতগুলো টাকা গুনোগার দিতে হবে—

—তা সে তখন পরে দেখা যাবে—

—না হে না—আমি তোমার হিতাকাঙ্খী, আমি তোমায় সে রিস্কের মধ্যে যেতে দিতে পারিনে—এ লোকটা বদমাইস, যদি পালিয়ে যায় তোমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের এখন এ সব বিপদের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়।

নিধু আর বেশি কিছু বলিতে পারিল না—টাকার ভাগ লইয়া প্রবীণ সাধন-মোক্তারের সঙ্গে ইতরের মতো তর্কাতর্কি করিতে তাহার প্রবৃত্তি

হইল না। সে শুধু বলিল—বেশ, তাই হবে। তবে জামিন মুভ করার ফি আমায় কিছু বেশি করিয়ে দিন, তিন টাকায় পারব না—

সাধন নিধুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—বল কি হে? জুনিয়র মোক্তারেরা কেন, অনেক সিনিয়র মোক্তার দু-টাকায় এ কেস করবে—তুমি বেশি পাচ্চ শুধু আমার বলা কওয়ায়, নইলে যদুদা বা হরিবাবু রয়েচেন কি জন্যে? তোমায় স্নেহ করি বলে আমি ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে তোমার কাছে নিয়ে আসচি—ভাবলাম—যদি পায়, তো আমাদের আপনার লোকেই টাকাটা পাক—

নিধুর রাগ হইল। সাধন সবদিক হইতেই তাহাকে ফাঁকি দিতে চাহিবেন—এ তাহার পক্ষে অসহ্য। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—আজ্ঞে না, আমি পাঁচ টাকার কমে পারব না—আপনি আসামীদের বলে দেবেন—

—সে কি হে! তুমি আবার ফি ডিকটেট্ করতে আরম্ভ করলে নাকি?

—আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি ওর কমে পারব না—আর একটা কথা, ফিয়ের টাকা আগাম দিতে হবে—

—নাঃ, তোমাদের মতো ছোকরাদের নিয়ে দেখচি মহাবিপদ। তোমরা বুঝলেও বুঝবে না। তা নিও, তাই নিও। কি আর করব? আপনার লোকের মতো দেখি তোমাকে—

সুনীলবাবুর এজলাসে জামিন মঞ্জুর করাইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। তাহার সাফল্য দেখিয়া হয়তো বা কোনো-কোনো প্রবীণ মোক্তার কিছু ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন ভাবিয়া নিধু এজলাসে উপস্থিত হরিহর নন্দীর কাছে গিয়া বলিল—হরিবাবু, কোনো ভুল করিনি তো?

হরিহর মোক্তার বলিলেন—কেন ভুল করবে? চমৎকার সওয়াল জবাব—

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আপনাদের কাছেই শিখেছি হরিদা। আপনাদের দেখে-দেখেই শেখা—এখন আশীর্বাদ করুন—

হরিহর নন্দী [illegible] উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—না, না, আশীর্বাদ তোমায় কি করব—তুমি ব্রাহ্মণ, ওকথা বলতে নেই। তোমরা ছেলে-ছোকরা তাই বোঝ না। তোমরা আমাদের প্রণম্য—তবে তোমার কল্যাণ কামনা করচি, উন্নতি তুমি একদিন করবে—

কোর্ট হইতে চলিয়া আসিবার সময় সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবু আজ দেশে যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আমার খাসকামরায় একবারটি আসেন যদি, একটা কথা আছে—

কোর্টে উপবিষ্ট অনেকগুলি তরুণ ও প্রবীণ মোক্তারের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সম্মুখে নিধু ত্রস্তপদে সুনীলবাবুর খাসকামরায় প্রবেশ করিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা চিঠি দেব।

—বেশ, দিন না—আমি দেব এখন।

—আর একটা কথা—আপনি সাধনবাবুকে কতটা জানেন?

—ভালোই জানি। কেন বলুন তো স্যর?

—উনি লোক কেমন?

—লোক মন্দ নয়।

সুনীলবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—তাই জিগগেস করচি। আচ্ছা, আপনি সোমবারে আসুন, একটা কথা বলব আপনাকে।

—বেশ, স্যর।

—লালবিহারীবাবুকে আমার প্রণাম জানাবেন—আর আপনি তো বাড়ির মধ্যে যান, পিসিমাকে বলবেন সামনের শনিবারে আমায় নেমন্তন্ন করেচেন, কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন সেদিন—দুদিন থাকবেন—সুতরাং কোথাও যাওয়া-আসা যাবে না। আপনারও যাওয়া হবে না।

—আমার? কেন?

—আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব ম্যাজিস্ট্রেটের।
—আমার মতো লোকের সঙ্গে ইণ্টারভিউ?
—এসব ভালো। আপনার পসারের পক্ষে এগুলো বড় কাজের হবে।
—আপার যা ইচ্ছে, স্যর।
শনিবারে কোর্ট বন্ধ হইতে চারিটা বাজিল। নিধু সঙ্গে-সঙ্গে বাসায় আসিয়া কোর্টের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ পোশাক পরিয়া কিছু খাইয়া লইল। পরে বাসার চাবি চাকরের হাতে দিয়া কুড়ুলগাছি রওনা হইল। এতদিন সে ভাবিবার অবসর পায় নাই। নানা গোলমালে দিন কাটিয়াছে। জামিন মুভ করিবার ফি না পাইলে আজ বাড়ি যাওয়াই ঘটিয়া উঠিত না। এতদূর রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। তা হইলেই বা কি? মঞ্জুর সঙ্গে সে আর দেখা করিবে না। তাহার সঙ্গে মঞ্জুর আর দেখাশোনা হওয়া ভুল। দুদিন পরে সে পরস্ত্রী হইতে চলিয়াছে—এখন তাহার সঙ্গে মেলামেশা করা মানে কষ্ট ডাকিয়া আনা। অতএব আর গিয়া সে মঞ্জুর সহিত দেখা করিবে না। মিটিয়া গেল। কিন্তু সে যতই গ্রামের নিকট আসিতেছিল—তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিজের মনেই সন্দেহ জাগিল। মঞ্জুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে তো? কেন পারিবে না? কতদিনেরই বা আলাপ? খুব পারিবে এখন। পারিতেই হইবে।
নিধুর মা বলিলেন—বাবা! কি ছেলে তুমি! এতদিন পরে মনে পড়ল?
—কি করি বল। এক পয়সা রোজগার নেই, এসে কি করব?
—নাই বা থাকল রোজগার। তোকে দেখতে ইচ্ছে করে না আমাদের? কালী, জল নিয়ে আয়।
নিধু হাত মুখ ধুইয়া খাবার খাইয়া মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। হঠাৎ নিধুর মা মনে পড়িয়া যাওয়ার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ভালো কথা! তোকে যে মঞ্জু কতবার আজ ডেকে পাঠিয়েছিল!

আগের দু শনিবারও ঠিক সন্দের আগে লোক পাঠিয়েচে খোঁজ নিতে তুই এসেচিস কিনা। একবার গিয়ে দেখা করিস্ সকালে। আজ বড্ড রাত হয়ে গেল। কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় বাহির হইতে নৃপেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ও কালী, ও পুঁটি-দিদি, নিধুদা আসেনি? নিধু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিল—এই তো এলাম। এস, এস, ভালো আছ নৃপেন?

—আমি আসব না, আপনি আসুন নিধুদা। বাবাঃ, আপনাকে খুঁজে খুঁজে—

—এতরাত্রে যাব? নটা সাড়ে-নটা হবে যে।

—দিদি পাঠিয়ে দিলে দেখতে আপনি এসেচেন কিনা—

—কিন্তু নিয়ে যেতে তো বলেনি? কাল সকালে যাব—

—আসুন আপনি—কিছু রাত হয়নি। আমাদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া মিটতে রাত বারোটা বাজে রোজ। এখন আমাদের সন্দে।

মঞ্জু অনেক অনুযোগ করিল। এতদিন কি হইয়াছিল—গ্রামের কথা কি এমন করিয়া ভুলিতে হয়? কি হইয়াছিল তাহার?

নিধু বলিল—পয়সার অভাব মঞ্জু। বাড়িভাড়া দিতে পারিনি বলে দুবেলা তাগাদা সইচি। কি করে বাড়ি আসি বল। কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়াই নিধু ভাবিল টাকা-পয়সা বা নিজের কষ্ট-দুঃখের কথা মঞ্জুর কাছে বলা উচিত হয় নাই। কিন্তু নিধুর উক্তি মঞ্জুর মুখে কেমন এক পরিবর্তন আনিল। সে সহানুভূতির সুরে বলিল—সত্যি নিধুদা?

—মিথ্যে বলব কেন?

—আপনি চলে এলেন না কেন? টাকা আমি দিতাম—আমায় বললেন না কেন এসে, মঞ্জু আমার টাকার দরকার, দাও। সেখানে অন্য কেহ তখন ছিল না—থাকিলে মঞ্জু একথা বলিতে পারিত না। নিধু বলিল—কেন

তোমাকে অনর্থক বিরক্ত করব? মঞ্জু তীব্রকণ্ঠে বলিল—অনর্থক বিরক্ত করা ভাবেন এতে নিধুদা? বেশ তো আপনি?

মঞ্জুর রাগ দেখিয়া নিধু অপ্রতিভ হইল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার কথার মধ্যে একটা অভিমানের সুর আসিয়া পৌছিয়া গেল। সে বলিল—সে জন্যে না মঞ্জু। তোমার টাকা নেব—তারপর পুজোর পর এখান থেকে চলে যাবে তোমরা, টাকাটা শোধ দিতে হয়তো দেরি হবে—

—এ ধরনের কথা আপনি বললেন আমায়! বলতে পারলেন আপনি?

—কেন পারব না? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয় আমার—জানো মঞ্জু?

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

—জানো না কেন? আর দুদিন পরে তোমরা চলে যাবে এখান থেকে। আবার হয়তো আসবে না কতদিন। হয়তো দু-দশ বছর। আমরা সামান্য অবস্থার মানুষ—বিদেশে যাওয়ার পয়সা নেই- দেখাই হবে না আর।

—ওঃ এই! নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমরা আসব মাঝে-মাঝে।

—তাতে কি? তোমার আর কতদিন? দুদিন পরে পরের ঘরে চলে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

—কেন নিধুদা, এসব কথা আপনার মাথার মধ্যে আজ এল কেন শুনি?

—কারণ না থাকলে কার্য হয় না। ভেবে ছাখ—

মঞ্জু ব্যস্তসমস্ত আগ্রহে বলিল—কি হয়েচে নিধুদা? কি অন্যায় করে ফেলেচি আমি? এমন কি কথা—

—আমি কিছু বলতে চাইনে। তুমি বুদ্ধিমতী—বুঝে দেখ—

মঞ্জু অল্প কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বুঝেচি নিধুদা।

—ঠিক বুঝেচ?

—হ্যাঁ।

—তবেই ভেবে ছাখ তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়া উচিত মঞ্জু? তুমি বড়লোকের মেয়ে—ভুলে যাবে। কিন্তু আমি গরিব জুনিয়ার মোক্তার—আমার প্রথম জীবনে যদি উৎসাহ ভেঙে যায়—উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়—আর কিছু করতে পারব না বারে। সব ফিনিশ—

মঞ্জু নিরুত্তর রহিল। নিধু চাহিয়া দেখিল তাহার বড়-বড় চোখ দুটি জলে টসটস করিয়া আসিতেছে—এখনি বুঝি বা গড়াইয়া পড়িবে।

নিধু বলিল—রাগ আমি করিনি, তোমার কোনো দোষ নেই তাও আমি জানি। দোষ আমারই, আমারই বোঝা উচিত ছিল। ভুল আমার।

মঞ্জু এবারও কিছু বলিল না, নতমুখে সিমেণ্টের মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধু বলিল—ও কথা আর তুলব না, থাক গে। তোমাদের প্রতিমা কই মঞ্জু? পুজো তো এসে গেল।

মঞ্জু জলভরা চোখে নিধুর দিকে চাহিল। কোনো একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে ছোট মেয়ে বকুনি খাইবার ভয়ে যেমন ভাবে গুরুজনের দিকে চায়—মঞ্জুর চোখে তেমনি মিনতি মাখানো ভয়ের দৃষ্টি। যেন সে এখনি বলিয়া ফেলিবে—যা হয়ে গিয়েচে, হয়ে গিয়েচে—আমায় আর বকো না তুমি।

নিধুর মন এক অপরূপ দয়া ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

তাহার কপালে যাহাই থাক—এই সরলা করুণাময়ী বালিকাকে সকল প্রকার ব্যথা ও লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইয়া লইয়া চলাই যেন তাহার জীবনের কাজ।

সে বলিল—বললে না প্রতিমা হচ্চে না কেন? পুজো হবে না?

—প্রতিমা এখানে হচ্চে না তো। দেউলে—সরাবপুরের কুমোরবাড়ি ঠাকুর গড়া হচ্চে—সেখান থেকে দিয়ে যাবে।

—তোমরা সেই প্লে করবে তো?

—আপনি যে রকম বলেন—

মঞ্জু যেন হঠাৎ ভরসাহারা ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। যে মঞ্জু চিরকাল হুকুম করিতে অভ্যস্ত, নিজের ইচ্ছার পথে কোনো বাধা যে কোনোদিন পায় নাই, বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে বলিয়াও বটে, সচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত বলিয়াও বটে—আজ যেন সে তাহার সমস্ত কাজের জন্যে নিধুর পরামর্শ খুঁজিতেছে। নিধু মঞ্জুর করিলে তবে যেন সে কাজে উৎসাহ পাইবে। একথা ভাবিতেই নিধুর মন আবার যেন সতেজ হইয়া উঠিল, মধ্যের দুঃখ ও অবসাদের ভাবটা কাটিয়া গেল।

—তা তুমি কর না মঞ্জু, আমি পেছনে আছি—

—পেছনে থাকলে চলবে না, আপনাকে পার্ট নিতে হবে—

—যদি বল, তাও নেব।

—আপনি পার্ট নেবেন না, প্লে-র মধ্যে থাকবেন না শুনলে আমার ওতে আর মন যায় না। উৎসাহ চলে যায়।

—কেন এরকম হল মঞ্জু? কোথায় তোমরা ছিলে, কোথায় আমরা ছিলাম ভাব তো!

—সে তো সব জানি। কিন্তু তা বললে মন কি বোঝে নিধুদা? মনে যা হয়, তাই হয়। বোঝালে কি কিছু বোঝে?

—কি বই করবে ঠিক করলে!

—বড়দা বলে গিয়েচেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' করতে—ওঁদের কলেজে এবার করবে। উনি শিখিয়ে দেবেন। পড়েচেন আপনি?

—পাগল তুমি মঞ্জু? আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি জানতে তোমার আর বাকি নেই। নাম শুনেচি, এই পর্যন্ত।

—কবিতা পড়েননি তাঁর?

—খুব কম।

—আমার কাছে 'চয়নিকা' আছে—নিয়ে যাবেন। ভালো বই—

—সে তো জানি। তাই থেকে সেবার 'কচ ও দেবযানী' করেছিলে—চমৎকার হয়েছিল, এখনো যেন দেখতে পাই চোখের সামনে।

—আর লজ্জা দেবেন না নিধুদা। ওকথা থাক। আপনাকে পার্ট নিতে হবে—নেবেন তো?

—তুমি বললেই নেব। কবে থেকে মহলা দেবে?

—কি দেব?

—তোমরা যাকে বল রিহার্স্যাল—কবে থেকে শুরু করবে?

—আপনার কথা শুনে এমন হাসি পায় আমার নিধুদা। দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। আমার মনে হয় আপনি সব সময় আমাদের মধ্যে থাকুন—আপনি যখন নিজের বাড়ি চলে যান জ্যাঠাইমার কাছে খেতে—আমি তখন কতদিন মাকে বলেচি, নিধুদা এখানেই তো দুপুরবেলা পর্যন্ত থাকে, বাড়ি যাবে কেন খেতে, তার চেয়ে এখানে কেন খেতে বললে না? মা বলতেন—দূর, রোজ-রোজ ও যদি তোদের বাড়ি না খায়? আমার কিন্তু মনে হত, বারে, আমরা নিধুদার পর হলাম কি করে? তা কেন লজ্জা করবে নিধুদার?

—আমিও তাই ভাবতাম কিন্তু। যদি যেতে না হয়, যদি সব সময় তোমাদের বাড়ির আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থাকি—

—আচ্ছা, রামনগরে থাকবার সময়ে আমাদের বাড়ির কথা আপনার মনে পড়ে না?

—পড়ে।

—কার-কার কথা মনে পড়ে?

—কাকাবাবুর কথা, কাকীমার কথা, বীরেনের কথা, নৃপেনের কথা, বুড়ো ঝিটার কথা, কুকুরটার কথা, বেড়ালটার কথা।

মঞ্জু মুখে আঁচল দিয়া ছেলেমানুষের মতো খুশিতে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—উঃ, মোক্তারী আপনি করতে পারবেন বটে নিধুদা। কথার ঝুড়ি সাজিয়ে ফেললেন যে! এদের সকলের কথা মনে পড়ে—না?

—যা পড়ে, তাই বলেচি।

—ভালোই তো। আমি কি বলেচি আপনি তা না বলেচেন? আমি আর কে, যে আমার কথা মনে পড়বে?

—তা, পড়লেই বা কি?

—আপনি মনে ব্যথা দিয়ে বড্ড কথা বলেন কিন্তু—সত্যি বলচি নিধুদা—কেন ওরকম করেন? আমার মন তো পাথরে তৈরি নয়?

মঞ্জু এইমাত্র হাসিবার সময় যে আঁচল মুখে দিয়াছিল—তাহাই তুলিয়া চোখে দিল। নিধু দেখিল সত্যই তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, শিক্ষিতা মেয়ে—অথচ কি ছেলেমানুষ মেয়ে মঞ্জু! আর কি অদ্ভুত লীলাময়ী। হাসি অশ্রু একই সময়ে মুখে চোখে বিরাজমান।

নিধু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, সত্যি মঞ্জু তুমি ভাবলে এসব সত্যি? আর সকলের কথা মনে পড়েচে—আর তোমার কথাই পড়ল না? এ তুমি বিশ্বাস কর?

—দেখুন মন যা বলে, মাঝে-মাঝে মানুষের কাছ থেকে তার জন্যে উৎসাহ পাওয়া চাই। তবেই মন খুশি হয়ে ওঠে। মুখে শোনা এজন্যে বড় দরকার। বলুন এবার?

—না, যা বলেচি, তার বেশি আর কিছু শুনতে পাবে না আমার কাছে মঞ্জু।

নিধু সে রাত্রে বাড়ি আসিয়া একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

কোথায় যেন সে একটা পথ বাহিয়া চলিয়াছে—তাহার সামনে একটা বড় পুকুর—পুকুরে এক রাশ পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পুকুরের পাড়ের ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর হইতে হাস্যমুখী মঞ্জু বাহির হইয়া আসিল, অথচ দুজনেই দুজনকে জানে ও চিনিতে পারিয়াছে। মঞ্জু যেন দুলেবাড়ির মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়, দুজনে অবাধ অসঙ্কোচে পুকুরপাড়ে বসিয়া জলে ঢিল ফেলিতেছে ও অনর্গল বকিয়া যাইতেছে—মঞ্জু জজের মেয়ে নয়, তাহার সঙ্গে মেশায় কোনো বাধা নাই যেন।

স্বপ্নের মধ্যেই নিধুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে যখন, ঠিক সেই সময় শাঁখের আওয়াজে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সে বাইরের রোয়াকে কালীকে দেখিয়া বলিল—কি রে কালী, শাঁখ বাজে কোথায় ?

—পুকুরঘাটে। আজ যে ওদের ঠাকুর-পুজোর ঘট পাতা হচ্চে—মা গেল—

—কাদের ঘট পাতা হচ্চে ?

—জজবাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজোর ঘট আজ পাততে হবে না ? এয়োস্ত্রী মেয়ে চাই, মা গিয়েচে অনেকক্ষণ—

—আর কে-কে এসেচে ?

—কাকীমা তো আছেন, ওপাড়া থেকে হৈম-দিদি এসেচে—

পুকুরঘাট হইতে শাঁখের আওয়াজ যখন আবার পথের দিকে আসিল,

তখন নিধু কিসের টানে উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল আগে-আগে মঞ্জুর মা, তাহার পেছনে মঞ্জু, তাহার মা, হৈম, ভুবন গাঙ্গুলির স্ত্রী আরও পাড়ার দু-চারজন ঝি-বৌ জল লইয়া ফিরিতেছে। মঞ্জুর পরনে লালপাড় শাদা শাড়ি, অনাড়ম্বর সাজগোজ—এতগুলি মেয়ের মধ্যে তাহার দিকে চোখ পড়ে আগে, কি চমৎকার গতিভঙ্গি, কি সুন্দর মুখশ্রী, সারাদেহের কি অনবদ্য লাবণ্য—

নিধুর মনটা হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

কেন এমন হয়? কোনদিন কি সে ভাবিয়াছিল মুন্সেফবাবু তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন? তাহার মতো জুনিয়ার মোক্তারের সঙ্গে? গ্রামের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে দরিদ্র, যাহার বাবা সর্বদা মুন্সেফবাবুদের বৈঠকখানায় বসিয়া তোষামোদ বর্ষণ করিয়া বড়লোকের মন রাখিতে চেষ্টা করেন—যাহার মা জজগিন্নি বলিতে ভয়ে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যায়—মুখ তুলিয়া সমানে-সমানে কথা বলিতে ভরসা পায় না—এই বাড়ি, এই ঘর চোখে দেখিয়াও উহারা সে বাড়ির ছেলের সঙ্গে অমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ দিবে—এ কি কখনো সে ভাবিয়াছিল?

যদি এ আশা সে না করিয়া থাকে, তবে আজ তাহার দুঃখ পাইবার কি কারণ আছে?

মঞ্জু দুদিনের জন্যে এ গ্রামে আসিয়াছে—বড়লোক পিতার খেয়াল এবার গ্রামে তিনি পূজা করিবেন, খেয়াল মিটিয়া গেলে হয়তো আর দশ বৎসর তিনি এদিক মাড়াইবেন না—ততদিনে মঞ্জু কোথায়? তাহার বিবাহ হইয়া ছেলেপুলে বড় হইয়া স্কুলে পড়িবে—মিথ্যা আশার কুহক।

সে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কালীকে বলিল—কালী, একটু তেল দে, নেয়ে আসি পুকুর থেকে—

—এত সকালে দাদা ?

—তা হোক—দে তুই—

এমন সময় নিধুর মা বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন—নিধু, ওদের বাড়ি যা—দুজন ব্রাহ্মণকে জল খাইয়ে দিতে হয় দুর্গাপুজোর পিঁড়ি পাতবার পরে। জজগিন্নি তোকে এখুনি যেতে বলে দিলেন।

নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া ওবাড়ি গেল। মঞ্জুও ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে—একজন ব্রাহ্মণ সে, অপর জন ভুবন গাঙ্গুলি।

ভুবন গাঙ্গুলি বলিলেন—এস বাবা, তোমার জন্যে বসে আছি—এঁরা ব্রাহ্মণকে না খাইয়ে কেউ জল খাবেন না কিনা।

—কাকা বেশ ভালো আছেন ? হৈম এসেচে দেখলাম না ?

—হৈম তো এ বাড়িতেই আছে, বোধ হয়—

মঞ্জু বলিল—হৈমদি ওই রান্নাঘরে, ডাকব নাকি ? কাকাবাবুকে বলছিলাম হৈমদি আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে—

ভুবন গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—করবে না কেন ? আমি তো বলেচি। লালবিহারীদাদার বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করবে, এ তো ওর ভাগ্যি। আমার আপত্তি নেই— ও হৈম, হৈম—

হৈম আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস, রঙ তত ফরসা না হইলেও দেহের গড়ন ও মুখশ্রী ভালো। সে যে বেশ সচ্ছল ঘরে পড়িয়াছে তাহার সিল্কের শাড়ি, দুহাতে মোটা সোনার বালা ও বাহুতে আড়াই পেঁচের তাগা দেখিলে তাহা বোঝা যায়—এ ছাড়া আছে কানে ইয়ারিং, গলায় মোটা সিকলি হার।

নিধু বলিল—চিনতে পার হৈম ?

হৈম হাসিয়া বলিল—কেন পারব না ? এ গাঁয়ের মেয়ে নই ?

—কবে এলে ?

—মাসখানেক হল এসেচি। তুমি ভালো আছ নিধুদা ?

—হ্যাঁ, এক রকম মন্দ নয়।

মঞ্জু বলিল—আমি হৈমদিকে বলেচি আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করতে।

হৈম হাসিয়া বলিল—তা করব না কেন ? বাবা তো বলেচেনই। নিধুদা, বই ঠিক করেচ ?

—সে করবে মঞ্জু।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বলিল—আমি পারব না নিধুদা, আপনি ঠিক করে দিন না। রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী'র কথা বড়দা বলেছিলেন—

হৈম দেখা গেল 'ফাল্গুনী'র নামও শোনে নাই, সে বলিল—সে কি ভালো বই ?

—সে খুব ভালো বই। এবার কলকাতায় হৈ-হৈ করে প্লে হয়ে গিয়েচে।

—তা তোমরা যেমন বল। নিধুদা আমাদের শিখিয়ে দেবেন—

—আমি আর কদিন আছি ? কাল তো সকালেই—

—দুদিন কেন ছুটি নাও না ?

মঞ্জুও সঙ্গে-সঙ্গে বলিয়া উঠিল—তাই কেন করুন না নিধুদা ?

—সে কি করে হয় ? তোমরা বোঝ না। এ কি কারো চাকুরি যে ছুটি নিতে হবে ? না গেলে আমারই লোকসান—

হৈম বলিল—তাহলে আজ ওবেলা বইটা দেখিয়ে একটু পড়ে দিয়ে যাও—

—মঞ্জু তো রয়েচে। ও সব পারে। ওর 'কচ ও দেবযানী' সেদিন শোনোনি হৈম, সে একটা শোনবার জিনিস !

মঞ্জু সলজ্জ সুরে বলিল—ছাই ! নিধুদার যেমন কথা ! না ভাই হৈমদি—

ভুবন গাঙ্গুলি জলযোগান্তে উঠিয়া বিদায় লইলেন। হৈম বলিল—বাবা, তুমি যাও—আমি এর পরে যাব। নিধুদা না হয় দিয়ে আসবে এখন।

মঞ্জু বলিল—হৈমদি, আমার ভাইয়েরা আর নিধুদা কিন্তু পার্ট নেবে—

হৈম চিন্তিত মুখে বলিল—তাই তো ভাই, এ শুনলে আমার কি বাড়িতে প্লে করতে দেবে ভাই?

—কেন দেবে না?

—পাড়াগাঁয়ের গতিক তো জানো না—কে কি বলবে সেই ভয়ে বাড়ির লোক যদি আপত্তি করে তাই ভাবচি।

নিধু বলিল—তাতে কি? আমি না হয় নাই করলাম—

মঞ্জু বলিল—তবে হবে কি করে? পুরুষমানুষের পার্ট মেয়েরা করতে গেলে অত মেয়ে কোথায় পাব এখানে?

—কেন, তোমাদের বাড়িতে তো অনেকে আসবেন পুজোর সময়—

—তাদের সকলকে দিয়ে এ কাজ হবে না—দু-একজনকে দিয়ে হতে পারে। তাছাড়া রিহার্স্যাল দেওয়া না থাকলে তারা প্লে করবে কি করে? এ তো ছেলেখেলা নয়! তুমি ভাই হৈমদি, বাড়িতে বলে এস ওবেলা—জিগগেস করে দেখ—

হৈম বলিল—এতে আমার ওপর যেন রাগ কোরো না নিধুদা, হয়তো ভাববে—

—আমি কিছু ভাবব না হৈম—মঞ্জু শহরে থাকে, ও পাড়াগাঁয়ের অনেক খবরই রাখে না—ওকে বরং বল—

মঞ্জু বলিল—চা হয়ে গিয়েচে—বস হৈমদি—নিয়ে আসি—

মঞ্জুর কথা শেষ হইতেই মঞ্জুর বিধবা খুড়ীমা ট্রে-র উপর চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এই নে চা, ওদের দে—মঞ্জু—

—তিন পেয়ালা কেন কাকীমা, নিধুদা তো চা খায় না—

—নিধু তুমি চা খাওনা? আমি তা জানিনে বাবা—গরম দুধ খাবে? এখন দুধ দিয়ে গেল—

—না কাকীমা—দুধ চুমুক দিয়ে খাব ছেলেমানুষ নাকি? আমার দরকার নেই—ব্যস্ত হবেন না মিছিমিছি—

নৃপেন আসিয়া বলিল—বাবা একবার নিধুদাকে বাইরে ডাকচেন দিদি—

বাহিরের বৈঠকখানায় লালবিহারীবাবু ও ভুবন গাঙ্গুলি বসিয়া। লালবিহারীবাবু প্রকাণ্ড গড়গড়াতে তামাক টানিয়া বৈঠকখানা প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সনাতন-পন্থী লোক—বাড়িতে ন-হাত কাপড় পরিয়া থাকেন—গায়ে সব সময় জামা বা ফতুয়া থাকেও না। কোনো প্রকার বড়লোকী চালচলন বা সাহেবিয়ানা এ গ্রামের লোক দেখে নাই তাঁহার। সাধারণ লোকের সঙ্গে গ্রামের পাঁচজনের মতোই মেশেন।

নিধু বলিল—আমায় ডাকচেন কাকাবাবু?

—হ্যাঁ হে, সুনীল কি সামনের শনিবারে আসবে না?

—আজ্ঞে না—চিঠি লিখেচেন তো সেই বলেই বোধহয়—পরের শনিবারে আসবার চেষ্টা করবেন—

—তুমি কি কাল যাচ্চ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তাহলে একবার বিশেষ করে অনুরোধ কোরো ওকে এখানে আসবার জন্যে—

—নিশ্চয়ই বলব—

—তুমি সুনীলের সঙ্গে মেশো তো?

—আজ্ঞে মিশি—তবে আমরা হলাম জুনিয়ার মোক্তার—আর তিনি হলেন আমাদের হাকিম—বুঝতেই তো পারেন—

—একখানা চিঠি দেব নিয়ে গিয়ে ওর হাতে দিও—

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেব—

নিধু পুনরায় বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া দেখিল হৈম ওরফে হেমপ্রভা দালানে বসিয়া নাই। মঞ্জু একা বসিয়া অনেকগুলো শিশিবোতল জড়ো করিয়া কি করিতেছে। মুখ তুলিয়া বলিল—আসুন নিধুদা, হৈমদি ওপরে গিয়েচে কাকীমার সঙ্গে কথা বলতে—বসুন—

—ওসব কি?

—মা'র কাণ্ড। আসবার সময় আচার এনেছিলেন, জ্যাম, জেলি—বর্ষায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েচে—দু-একটা যা ভালো আছে দেখে-দেখে তুলচি—বাকি ফেলে দিতে হবে—খাবেন নিধুদা? এই একরকম জিনিস আছে মাদ্রাজি জিনিস—একে বলে ম্যাঙ্গো পার্ল—চিনির মতো দেখতে। একটু খেয়ে দেখুন, ল্যাংড়া আমের গন্ধ—আম খাচ্চি মনে হবে—

নিধু একটু চিনির মতো গুঁড়া হাতে লইয়া মুখে ফেলিয়া বলিল—বাঃ, সত্যিই তো আমের গন্ধ! আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, এসব কোথায় পাব বল। মঞ্জুর বড়-বড় চোখে যেন বেদনার ছায়া পড়িল—সে নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ওসব বলতে আছে—ছিঃ—কষ্ট হয় না?

মঞ্জুর সুর হঠাৎ এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় মাখানো, এমন স্নেহপূর্ণ মনে হইল নিধুর—যে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যে কথা—তাহার জন্য সে সারাদিন অনুতাপ করিয়াছিল মনে-মনে। দোষও নাই—নিধু তরুণ যুবক, এই তাহার জীবনের অনাত্মীয়া প্রথম নারী, যে তাহাকে স্নেহের ও প্রীতির চোখে দেখিয়াছে। জীবনের এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা তাহার। নিধু বলিয়া ফেলিল—আর আমার কষ্ট হয় না মঞ্জু? তোমার জন্যে আমার মন কাঁদে না বুঝি?

মঞ্জু পাথরের মূর্তির মতো অবাক ও নিশ্চেষ্ট ভাবে নিধুর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নিধু আবার বলিল—আমি এখন দু-শনিবার আসব না—

—কেন নিধুদা ?

—সামনের শনিবারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন—তার পরের শনিবারে তোমাদের এখানে সুনীলবাবু আসবেন—এই মাত্র কাকাবাবু ডেকে বললেন—

—কি বললেন ?

—সেই শনিবারে আসবার জন্যে বললেন—আমি আর কক্ষনো আসব না মঞ্জু। আমার বুঝি মন বলে জিনিস নেই, না ? আমি আসতে পারব না—তুমি কিছু মনে কোরো না।

মঞ্জু অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিধুর মুখে চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার পদ্মের পাপড়ির মতো ডাগর চোখ দুটি বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। নিধুর কথার সে কোনো জবাব দিল না—হঠাৎ যেন সব কাজে সে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল—জ্যাম জেলির শিশি-বোতল অগোছালো ভাবে ইতস্তত পড়িয়াই রহিল—তাহার মধ্যে ভরসাহারা ক্ষুদ্র বালিকার মতো মঞ্জু বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে— ছবিটা চিরকাল নিধুর মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

নিধু বলিল—ওঠ মঞ্জু, আমার ভুল হয়ে গিয়েচে—আর কিছু বলব না।

মঞ্জু জলভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আসবেন তো ওবেলা—এখানে কিন্তু খাবেন।

—খাওয়ানোর লোভে তোমার নিধুদা ভুলবে ভেবেচ তুমি ? অমন লোক পাওনি—

—আমি কি তাই ভাবচি ? গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধান আপনি—

—আমি এখন আসি, ওবেলা আবার আসব—

—না বসুন, এখুনি গিয়ে কি করবেন ? আপনাদের বন্ধ হবে কবে ?

—এখনো চোদ্দ-দিন বাকি, মহালয়ার দিন থেকে বন্ধ হবে শুনচি—

—কোর্ট বন্ধ হলে এখানে চলে আসবেন তো ?

—ঐ যে বললাম, নয় তো আর যাব কোথায় ! বড়লোক নই যে হিল্লি-দিল্লি মক্কা যাব। এই বাঁশবনেই কাটল চিরকাল, এই বাঁশবনেই আসতে হবে।

—এক কালে বড়লোক হবেন তো, তখন কোথায় যাবেন ?

—আমি হব বড়লোক ! তবেই হয়েচে ! তুমি হাসালে দেখচি মঞ্জু !

মঞ্জু গম্ভীর ভাবে বলিল—কে বলেচে আপনি বড়লোক হবেন না ? আমি বলচি দেখবেন আপনি খু—উ—ব বড়লোক হবেন।

—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মঞ্জু—

—তা যদি হয়, আজকের দিনের কথা আপনার মনে থাকবে ? দাঁড়ান আজ কি তারিখ, ক্যালেণ্ডারটা দেখে আসি ওঘর থেকে—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্জু লঘুগতি হরিণীর মতো ত্রস্তভঙ্গিতে ছুটিয়া গেল পাশের ঘরে—এবং তখনি হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আপনার ডায়েরী আছে ? লিখে রাখবেন গিয়ে সতেরোই সেপ্টেম্বর—আমি বলেছিলুম আপনি বড়লোক হবেন—আমি, মঞ্জরী দেবী—

নিধু হাসিতে-হাসিতে বলিল—বয়েস ষোলো, সাকিন কুড়ুলগাছি মহকুমা রামনগর—থানা—ওই - পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী—

মঞ্জু খিল-খিল করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল—থাক, থাক—ওকি কাণ্ড ! বাবারে, আপনি এতও জানেন ! আমি ভাবি নিধুদা বড় ভালোমানুষ, নিধুদা আমাদের মোটে কথা বলতে জানে না। নিধুদা দেখচি কথার ঝুড়ি।

—কথার ঝুড়ি না হলে কি মোক্তার হয় মঞ্জু ? তবে আর ব্যবসাতে উন্নতি করব কি করে, বড়লোকই বা হব কি করে বল !

—আচ্ছা, যদি বড়লোক হন, আমার কথা মনে থাকবে ?

হঠাৎ তাহার মুখ হইতে তরল কৌতুকের হাসি অপসৃত হইল—চোখের

কোণে বেদনার ছায়াপাতে মুখখানি অপরূপ ব্যথাভরা লাবণ্যে ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল—এক মুহূর্তে যেন মনে হইল এ মঞ্জু ষোড়শী বালিকা নয়, বহুযুগের প্রৌঢ়া জ্ঞানময়ী, বহু অভিজ্ঞতা ও বহু ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা লব্ধশক্তি পুরাতন নারী—বালিকা হইয়া আজ আসিয়াছে সে, সে ইহার নিতান্তই লীলা—আরও কতবার এভাবে আসিয়াছে।

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। মঞ্জুকে সে আর খোঁচা দিয়া কথা বলিবে না, বালিকার মনে কেন সে মিছামিছি কষ্ট দিতে গিয়াছিল? মঞ্জু চপলা বটে, কিন্তু সে গভীর, সে ধীর বুদ্ধিমতী, অতলস্পর্শ তাহার মনের রহস্য। এতদিন সে মঞ্জুকে ঠিক চিনতে পারে নাই। নিধু কোনো কথা বলিতে পারিল না, কথার সে উত্তর দিতে পারিল না। জীবনে এমন সময় আসে, এমন মুহূর্তের সন্ধান মেলে—যখন কথা মুখ দিয়া বাহির হইলেই মনে হয় এই অপরূপ মুহূর্তটির জাদু কাটিয়া যাইবে, ইহার পবিত্রতার ব্যাঘাত ঘটিবে। তাহার বুকের মধ্যে কিসের যেন ঢেউ উপরের দিকে ধাক্কা দিতেছিল—সেটাকে আর একটু প্রশ্রয় দিলেই সেটা কান্নারূপে চোখ দিয়া গড়াইয়া সব ভাসাইয়া ছুটিবে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ—নিস্তব্ধতা যে একটা মনোরম মায়া সৃষ্টি করিয়াছে এই ঘরের মধ্যে—তা যত কম সময়ের জন্যেই হোক না কেন কেহ চাহে না যে আগে কথা বলিবার রূঢ় আঘাতে তাহা ভাঙিয়া দেয়।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকিলেন নিধুর মা।

—হ্যাঁরে, ও নিধু—এখানে বসে? মঞ্জু মা কি করচ শিশি-বোতল নিয়ে? ওগুলো কি মা?

—আসুন, আসুন, জ্যাঠাইমা—সকালে যে!

—তোমাদের পুজোর পাটাপাতা দেখতে এলাম—তা এত সকালে পাটা পাতলে যে তোমরা! এখনো তো পুজোর সতেরো দিন বাকি—

—তা তো জানিনে জ্যাঠাইমা, পুরুতমশাই কাল নাকি কাকাকে বলে গিয়েচেন—

—দিদি কোথায় দেখচিনে যে ?

—মা ? ওপরের ঘরে পুজো করচেন বোধ হয়— ডাকব ?

—না, না, মা পুজো করচেন, ডাকতে হবে কেন—থাক। আমি এমনি দেখতে এলাম—

—জ্যাঠাইমা, একটু চা খাবেন না ?

—না মা, আমি এখনো নাইনি-ধুইনি— বেলা হয়ে গেল। এইবার নাইতে যাব গিয়ে। নিধু থাকবি নাকি না আসবি ?

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা, নিধুদা যেন আপনার ছোট্ট খোকাটি, ওকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা থাকতে পারেন না, বাইরে কোথাও দেখলে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে ! নিধু সলজ্জমুখে বলিল—তুমি যাওনা মা, আমি যাব এখন। নিধুর মা কিন্তু তখনি চলিয়া গেলেননা, তিনিআরওআগাইয়া আসিয়া বলিলেন—ওগুলো কিসের শিশি-বোতল মা ? খালি আছে ?

—এগুলো জ্যাম-জেলি—ইয়ে—আচারের-মোরব্বার শিশি—জ্যাঠাইমা, বর্ষায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই বেছে রাখছিলাম—

—আমি ভাবলাম বুঝি খালি আছে।

—কি হবে খালি শিশি ? দরকার জ্যাঠাইমা ?

—এই জিনিসটা পত্তরটা রাখতে—এসব জায়গায় তো পাওয়া যায় না—বেশ শিশিগুলো—

নিধু সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। সে বুঝিল রঙচঙ্‌ওয়ালা শিশিগুলি দেখিয়া মা'র লোভ হইয়াছে—মেয়েমানুষের কাণ্ড ! তা দরকার থাকে, এখানে চাহিবার দরকার কি ? মাকে লইয়া আর পারা যায় না ! ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে এদের !

মঞ্জু সসব্যস্ত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা—শিশির দরকার ? আমি ভালো শিশি এনে দিচ্চি। বিলিতি জেলির খালি বোতল আছে মা'র ঘরে দোতলায়। আমি আসচি এখুনি—বসুন জ্যাঠাইমা। মঞ্জু ঘর হইতে ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দুটি সুদৃশ্য লেবেলমারা খালি বোতল আনিয়া নিধুর মা'র হাতে দিয়া বলিল—এতে হবে জ্যাঠাইমা ?

নিধুর মা বোতল দুটি হাতে পাইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন—খুব হবে মা, খুব হবে। আশীর্বাদ করি বেঁচে-বর্তে থাক—রাজরানী হও মা—আমি আসি তাহলে এবেলা—

নিধুও মায়ের পিছু-পিছু বাড়ি আসিল। বাড়িতে পা দিয়াই সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া মাকে বলিল—আচ্ছা, মা, তোমার কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ? কি বলে দুটো খালি বোতল ভিক্ষে করতে গেলে ও-বাড়ি থেকে ? তোমার এই মাগুনতুড়ে স্বভাবের জন্যে আমার মাথা হেঁট হয় তোমার সে জ্ঞান আছে ? ছিঃ-ছিঃ—এতটুকু কি কাণ্ডজ্ঞান ভগবান দেননি ?

নিধুর মা বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—ওমা, তা তুই আবার বকিস কেন ? কি করেচি আমি !

—তোমার মুণ্ডু করেচ, নেও—এখন শিশিবোতল সাজিয়ে রেখে ঘরে ধুনো দেও। ওতে তোমার কি মালমসলা, অপরূপ সম্পত্তি থাকবে শুনি ?

—তুই তার কিছু বুঝবি ? লবঙ্গ, ধনের চাল, হল গিয়ে গোটার গুঁড়ো কত কি রাখা যায় ! কেমন চমৎকার বোতল দুটো ! এখানে কোথায় পাবি ওরকম ?

নিধু আর কিছু বলিল না। মাকে বুঝাইয়া পারা যাইবে না—নিতান্ত সরলা, নিধুর লজ্জা যে কোথায়—তাহা তিনি বুঝিবেন না।

জগোঠাকরুণ পুকুরঘাটে নিধুর মাকে বলিলেন—বলি বড় বাড়ির পুজোর কতদূর, ও নিধুর মা ?

—পিরতিমে গড়ানো হচ্ছে—আজ পাটা পাতা হল ওবেলা—

—পাটা এখন আবার কে পাতে ? বিধেন দিলে কে গা ?

—কি জানি—তবে মঞ্জু বলছিল ওদের ভটচাজ্জি দিয়েচেন। আমিও ওকথা বলেছিলাম ওবেলা।

—হ্যাঁগা নিধুর মা, একটা কথা শুনলাম, কি সত্যি ? নাকি মেয়ে-পুরুষে মিলে থিয়েটার করবে ? ওদের বাড়ির মেয়েরা আর ওই ভুবন গাঙ্গুলির মেয়ে হৈম, তোমাদের নিধু—আরও নাকি কে-কে ?

—তাতো দিদি বলতে পারলাম না—আমি কিছু শুনিনি—

বাস্তবিকই নিধুর মা একথার কিছুই জানিতেন না।

জগোঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন—আর কি সেদিন আছে গাঁয়ের ! ছোট-ঠাকুরের প্রতাপে এক সময়ে এ গাঁয়ে যা খুশি করে পার পাবার উপায় ছিল না। তা সবাই গেল মরে হেজে—এখন টাকা যার, সমাজ তার। নইলে এ সব থিরিস্টানি কাণ্ড কি হতে পারত কখনো এখানে ? আমি ভুবনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিইচি ওবেলা। বললাম—মেয়েকে যে থিয়েটার করতে দিচ্চ, ওরা না হয় জজ-মেজেস্টার লোক, টাকার জোরে তরে যাবে—তোমার মেয়ের কুচ্ছো রটলে যদি শ্বশুরবাড়ি থেকে না নেয় ?

—ভুবন ঠাকুরপোকে বললেন ?

—কেন বলব না শুনি ? জগোঠাকরুণ—কারো এক চালে বাসও করে না, কাউকে কুকুরের মতো খোসামোদও করে বেড়ায় না—কারো কাছে কোনো পিত্যেশ রাখিনে কোনোদিন—

শেষের কথাটা নিধুর মাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলা—কিন্তু নিধুর মা তাহা বুঝিতে পারিলেন না—খুব সূক্ষ্ম উক্তি বা একটু বাঁকা ধরনের কথাবার্তা হইলে নিধুর মা তাহা আর বুঝিতে পারেন না।

কথাটা তিনি নিধুকে আসিয়া বলিলেন। নিধু বৈকালের দিকে মঞ্জুদের

বাড়ি গেল মঞ্জুর বাবাকে দেখিতে—কারণ তাঁহার রক্তের চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় দুপুরের পর হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—সেখানে গিয়া দেখিল মঞ্জু বাবার ঘরের বাহিরে দোতলার বারান্দাতে বসিয়া সেলাই করিতেছে। নিধুকে দেখিয়া বলিল—আস্তে-আস্তে নিধুদা, বাবা এবার একটু ঘুমিয়েচেন। চলুন আমরা নিচে যাই বরং—

—একবার ওঁকে দেখে যাব না?

—এখন থাক। ঘুম যদি সন্দের আগে ভাঙে, তবে দেখতে আসবেন এখন। সিঁড়িতে নামিবার সময় নিধু মায়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সব বলিল। মঞ্জু শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য হইল না, বলিল—হৈমদি নিজেই একথা তো ওবেলা বলে গেল। আমরা যদি পুরুষ না নিই—তবুও তাঁরা বাড়িতে করতে দেবেন না?

—তাও বলতে পারিনে—আপত্তি যদি করে তাতেও করতে পারে—

বলিতে-বলিতে হৈমের গলা শোনা গেল, বাহির হইতে ডাকিতেছে—ও মঞ্জু, ও নৃপেন—

মঞ্জু ছুটিয়া আগাইয়া লইয়া আসিতে গেল। এবেলাও হৈম খুব সাজগোজ করিয়া মুখে ঘন করিয়া পাউডার মাখিয়া, চুলে ফ্যান্সি খোঁপা বাঁধিয়া ও ফুল গুঁজিয়া আসিয়াছে। বাড়ি ঢুকিয়াই সে বলিল—নিধুদা আসেনি?

—এসে বসে আছেন। এস দালানে হৈমদি—

—আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রিহার্স্যাল দিতে হবে কিন্তু—

—শোনেননি হৈমদি, বাবার বড় অসুখ যে—

হৈম বিস্ময়ের সুরে বলিল—জ্যাঠামশায়ের অসুখ? কি অসুখ?

—ব্লাড প্রেসার বেড়েচে—ওই নিয়েই তো ভুগচেন। তাই আজ আর রিহার্স্যাল হবে না।

—না তা আর কি করে হবে! এখন কেমন আছেন উনি?

—এখন একটু ভালো। এসব কলকাতার রোগ হৈমদি, পাড়াগাঁয়ে এসব নেই বলে মনে হয় আমার।

হৈম একটু পরেই বলিল—তাহলে আজ যাই মঞ্জু ভাই—আমি—

হঠাৎ মঞ্জুর মনে পড়িয়া গেল কথাটা। বলিল—হৈমদি, তোমার বাবা কিছু বলেচেন নাকি তোমার এবিষয়ে?

—কি বিষয়ে?

—এই থিয়েটার করা নিয়ে।

—তা তিনি বলতে পারেন না। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আপত্তি না করলেই হল। আমি ওসব মানিনে—

—সে কথা নয় হৈমদি—গাঁয়ের কে এক বুড়ি (নিধু নাম বলিয়া দিল)—হ্যাঁ সেই জগোঠাকরুণ আপনার বাবাকে কি সব বলেচেন। পুরুষের সঙ্গে মিশে থিয়েটার করলে বা এমনিই থিয়েটার করলে তোমার মেয়ের বদনাম রটবে।

হৈম তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ, এই কথা! ও আমি গ্রাহ্যি করিনে। আমি যা খুশি করব—তাতে বাবা পর্যন্ত কিছু বললে শুনচিনে তো জগোঠাকরুণ! আচ্ছা এখন তাহলে আসি—

—বারে, চা খেয়ে যান হৈমদি—

—না ভাই, আর একদিন এসে খাব। নিধুদা, আমায় একটু এগিয়ে দাও না?

নিধু মঞ্জুকে বলিল—বস মঞ্জু, আমি ওই তেঁতুল-তলার মোড় পর্যন্ত হৈমকে এগিয়ে দিয়ে আসচি—

পথে পড়িয়া হৈম বলিল—তুমি থিয়েটার করবে তো নিধুদা?

—আমার আর করা হয় হৈম? গাঁয়ের মধ্যে যদি কথা ওঠে এ নিয়ে—

—ওঃ, ভারি কথা! তুমি না করলে আমিও করব না নিধুদা, তুমি আছ তাই করচি।

নিধু আশ্চর্য হইয়া হৈমর মুখের দিকে চাহিল। হৈম বলে কি!

হৈম পুনরায় বলিল—আমার কথা মনে হয় নিধুদা? বল না নিধুদা—

নিধু একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। হৈমর এ সব কথায় সে কি উত্তর দিবে? হৈম একটু গায়ে-পড়া ধরনের মেয়ে তাহা সে পূর্বেই জানিত। ভাবিয়াছিল, আজকাল বিবাহ হইয়া ও বয়স হইয়া বোধ হয় সারিয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে তা নয়।

পরে মুখে বলিল—হ্যাঁ—তা মনে হত না কি আর? গাঁয়ের মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসচি—

—আজ সন্দেবেলা আমাদের বাড়ি এস না কেন নিধুদা- ওখানে চা খাবে—বেশ গল্প করা যাবে এখন—

—আমি চা তো খাইনে হৈম—তা ছাড়া সন্দেবেলা মঞ্জুদের বাড়ি থিয়েটার সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলতে হবে, যাই কি করে?

—কাল আসবে? না—ও, কাল তো তুমি চলেই যাবে। কাল দিনটা নাই বা গেলে নিধুদা?

কি বিপদ! ইহার এত জোর আসিল কোথা হইতে? নিধু বলিল—না গেলে চলে হৈম? কত দরকারি কেস সব হাতে রয়েচে। যেতেই হবে।

হৈম অভিমানের সুরে বলিল—আমার কথা রাখবে কেন? মঞ্জুর কথা হত তো রাখতে—

—আচ্ছা, সামনের শনিবারে এসে তোমাদের ওখানে যাব, হৈম।

হৈম হাসিয়া নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ঠিক যাবে তো? তাহলে কথা রইল কিন্তু। এ গাঁয়ে এসে আমার মন মোটে টেকে না নিধুদা—মোটে মিশবার মানুষ নেই—আমি চিরকাল গোয়াড়ী স্কুলে থেকে পড়েচি—জানো তো? আমি গাঁয়ে এসে যেন হাঁপিয়ে উঠি—একটু আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই—এমন একটা লোক নেই, যার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে সুখ

হয়। তবুও মঞ্জুরা এসেছিল, ওরা শহরের মেয়ে, আমোদ করতে জানে। ওই বলচে থিয়েটার করবে—আমার ওতে ভারি উৎসাহ। সময়টা তো বেশ কাটবে ? তাই আমি—তুমি থাক—আমার বেশ ভালো লাগে—

হৈম নিধুর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—সত্যি কিন্তু আসবে সামনের শনিবারে নিধুদা, আমার মাথার দিব্যি—সেদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে চা খাবে—

—চা আমি খাইনে হৈম—

—চা না খাও, খাবার খেও। আর আমরা গল্প করব, ঠিক রইল কিন্তু—

—থিয়েটার তাহলে তুমি করবে ? কিন্তু জগোঠাকরুণ কি বলেচে আজ মা'র কাছে শুনেচ তো ?

—বলুক গে। আমি ওসব মানিনে। আমার শ্বশুরবাড়ি তেমন নয়—কেউ কিছু বলবে না।

—সে তুমি বোঝ, আমার কানে কথাটা উঠেচে যখন তোমাদের কাছে বলা আমার উচিত। মঞ্জুদের কেউ কোনো দোষ ধরবে না, কেন না ওরা হল বড়লোক—ওরা এখানে থাকবেও না। ওদের কে কি করবে ?

—আমারও কেউ কিছু করতে পারবে না। জীবনে দুদিন আমোদ করব না, আহ্লাদ করব না—মুখ বুজিয়ে বসে থাকব এই অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, সে আমার দ্বারা হবে না।

—আচ্ছা, তুমি এস হৈম—

—কোথায় যাবে এখন ? মঞ্জুদের বাড়ি ?

—না বেলা হয়েচে—এখন বাড়ি যাব।

—ওবেলা যাবে ওখানে—তাহলে আমিও আসি।

নিধু মনে-মনে বিরক্ত হইলেও বলিল—তার এখন কিছু ঠিক নেই—আসতেও পারি। এখন বলতে পারিনে—

বৈকালের দিকে নিধু ভাবিল সে মঞ্জুদের বাড়ি যাবে কিনা। মন সেখানে যাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া আছে যেন। অথচ বেশ বোঝা যাইতেছে সেখানে আর তাহার যাওয়া উচিত নয়। বেলা পড়িয়া আসিল—তবুও নিধু ইতস্তত করিতে লাগিল—এবং তারপরই সে হঠাৎ কিসের টানে সব কিছু দ্বিধা ভুলিয়া কখন উহাদের বাড়ির দিকে রওনা হইল।

মঞ্জুদের বৈঠকখানার কাছে গিয়া মনে হইল—আজ মঞ্জু তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই তো! অথচ রোজই ডাকিয়া পাঠায়। মনের মধ্যে কোথা হইতে অভিমান আসিয়া জুটিল। নিধু আর মঞ্জুদের বাড়ি না ঢুকিয়া গ্রামের বাহির রাস্তার দিকে বেড়াইতে গেল।

পূজার আর বেশি দেরি নাই। আকাশে বাতাসে যেন আসন্ন শারদীয়া পূজার আভাস, আকাশ মেঘমুক্ত, সুনীল—পাকা রাস্তার ধারে ঝোপে-ঝাপে মটরলতায় থোকা-থোকা ফল ধরিয়াছে—আউস ধান কাটা হইয়া গিয়াছে—আমন ধানের নাবাল খেত ভিন্ন মাঠ প্রায় শূন্য। পনরোদিন বৃষ্টি হয় নাই—গুমট গরম, কোনোদিকে একটু হাওয়া নাই।

একটা সাঁকোর উপর বসিয়া নিধু ভাবিতে লাগিল—মঞ্জু আজ তাহাকে কেন ডাকিল না? ওবেলা তাহার কথাবার্তায় হয়তো মনে দুঃখ পাইয়াছে। শিশিবোতলের মাঝখানে উপবিষ্ট মঞ্জুর ভরসাহারা করুণ মুখের ছবি মনে আসিল। মঞ্জুকে সে কোনো দুঃখ দিবে না। এ ব্যাপার লইয়া আর কোনো কথা সে মঞ্জুকে বলিবে না।

কিন্তু রবিবার তো ফুরাইয়া আসিল। সন্ধ্যার দেরি নাই। আর কতক্ষণ? সত্যই কি সে মঞ্জুদের বাড়ি দেখা করিতে যাইবে না? তাহা হয় না। এখন গেলে তবুও রাত নটা পর্যন্ত থাকিতে পারিবে। নয় তো আবার সাতদিন অদর্শন। থাকা অসম্ভব তাহার পক্ষে।

নিজের বাড়ির সামনে আসিয়া নিধু ইতস্তত করিতেছে—এমন সময় সে

দেখিল মঞ্জু এবং তাহার পিসতুতো বৌদিদি ওদিকের পথ দিয়া আসিতেছে। নিধুকে দূর হইতে দেখিয়া মঞ্জু বলিল—ও নিধুদা, দাঁড়ান—

নিধু বলিল—তোমরা কোথাও গিয়েছিলে নাকি, মঞ্জু?

—আমি আর বৌদি হৈমদির বাড়ি, আর ওদের পাশে পরেশকাকাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম যে। সেই কখন বেলা তুটোর সময় গিয়েচি—আসব-আসব করচি—কিন্তু হৈমদি'র মা চা খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না—তাই একেবারে সন্দে হয়ে গেল।

—তা তো জানি নে—ও!

—আপনি গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি?

—আমি একটু বেড়িয়ে ফিরচি—তোমাদের ওখানে যাওয়া হয়নি—

—আমিও ভাবচি নিধুদা এসে কি বসে আছে? আরও তাড়াতাড়ি করচি। জিগগেস করুন বৌদিকে—না বৌদি?

মঞ্জুর বৌদিদি বলিলেন—হ্যাঁ, ও তো অনেকক্ষণ থেকে আসবার ঝোঁক করচে—তা একজনের বাড়ি গেলে কি তক্ষুনি আসা ঘটে? বিশেষ কখনো যখন যাইনে—

মঞ্জু বলিল—আসুন নিধুদা, চলুন আমাদের বাড়ি—

নিধুর অভিমান অনেক আগেই কাটিয়া গিয়াছিল। মঞ্জু যে আজ তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, তাহার সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান।

বাড়িতে পৌঁছিয়া মঞ্জু বলিল—কি খাবেন বলুন নিধুদা—

মঞ্জুকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। নিজের বাড়িতে বসিয়া থাকে বলিয়া মঞ্জু কখনো সাজগোজ করে না—আজ পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া সে চওড়া শাদা জরির পাড় বসানো চাঁপা রঙের ভালো সিল্কের শাড়ি ও ফিকে গোলাপী রঙের ব্লাউজ পরিয়াছে—কপালে টিপ, চমৎকার ঢিলে খোঁপা বাঁধিয়াছে—পায়ে মাদ্রাজি স্যাণ্ডেল—খুব মৃদু

এসেন্সের সৌরভ তাহার চারিপাশের বাতাসে। মুখশ্রীতে প্রগল্‌ভতা নাই, অথচ বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্ত সজীব ভঙ্গি তাহার মুখে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, কথা বলিবার ধরনে।

নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—তা—যা খাওয়াবে—

—আপনার জন্যে কি খাবার করে রেখেছিলাম জানেন ? বলুন তো ?

নিধু বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই। নিমকি ভেজেছিলুম নিজে বসে, দুপুরের পর একঘণ্টা ধরে। বৌদি বেলে দিলে, আমি ভাজলাম—গরম-গরম দেব বলে আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি নৃপেনকে—এমন সময়ে হৈমদির মা, হৈমদি সবাই এলেন ওঁদের বাড়ি নিয়ে যেতে—

—ও, ওঁরা এসেছিলেন বুঝি ?

—তবে আর বলচি কি ? এসে কিছুতেই ছাড়লেন না—যেতেই হবে। মা বললেন—তবে তুই যা, আমি নিধুকে ডেকে খাওয়াব এখন। আমি বললাম—তা হবে না মা। আমি ফিরে এসে ডেকে পাঠাব।

—এত কথা কিছুই জানিনে আমি।

—কি করে জানবেন ? একবার ভাবলাম আপনাদের বাড়ি হয়ে যাই—কিন্তু ওঁরা সব ছিলেন—হৈমদি কিন্তু বলেছিল—

—কি বলেছিল হৈম ?

—হৈমদি বললে নিধুদাকে ডেকে নিয়ে গেলে হত। ওর মা বারণ করলেন।

—হৈমর মা বারণ করে ঠিকই করেচেন। হৈম শহরে-বাজারে কাটিয়েচে, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার ও কিছু বোঝে না। মেয়েরা যাচ্ছে বেড়াতে, তার মধ্যে একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে যাওয়া—লোকে কি বলবে ?

মঞ্জুর উপর অভিমানের বিন্দুমাত্রও এখন আর নিধুর মনে নাই বরং মঞ্জুর স্নেহে ও প্রীতিতে অযথা সন্দেহ করার দরুন নিধু মনে-মনে যথেষ্ট লজ্জিত

ও দুঃখিত হইল। মঞ্জু বলিল—বসুন, নিমকি নিয়ে আসি গরম করে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেতে পারবেন না।

—শোনো-শোনো, অত-শত করে কাজ নেই—যা আছে তাই ভালো।

মঞ্জু কিন্তু কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়াই গরম-গরম নিমকি আনিয়া দিল নিধুকে। বলিল—আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিধুদা, আপনাকে না খাওয়াতে পেরে। ভাবলাম সন্দে হয়ে গেল—আপনার সঙ্গে আর কখনই বা দেখা হবে! সকালে উঠে তো চলেই যাবেন—

নিধু হাসিয়া বলিল—সত্যি বলতে গেলে আমার রাগ হয়েছিল তোমার ওপর—

—কেন, কি অপরাধ হল?

—রোজ বিকেলে ডাকতে পাঠাও আজ কেউ গেল না ডাকতে। আমি বড় রাস্তার দিকে বেড়াতে বার হলাম—

মঞ্জু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওইখানে আপনার দোষ। আমাদের পর ভাবেন কিনা তাই না ডাকলে আসেন না—

—সে জন্য নয় মঞ্জু, তোমরা বড়লোক, যখন তখন ঢুকতে ভয় করে—

—ওই ধরনের কথা শুনলে আমার কষ্ট হয় বলেচি না?

—মঞ্জু, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ওবেলা তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েচি চোখের জল ফেলিয়েচি। সেই থেকে আমার মন মোটেই ভালো নেই। তুমি ছিলে কোথায় আর আমি ছিলাম কোথায়, এতদিন তোমার নামও জানতাম না। কিন্তু আলাপ হয়ে পর্যন্ত তোমাকে আর পর বলে মনে হয় না। তাই এমন কথা বলে ফেলি যা হয়তো পরকে বলা যায় না। তুমি জজবাবুর মেয়ে বলে তোমায় সবাই সমীহ করে চলবে—কিন্তু আমি ভাবি ও তো মঞ্জু।

মঞ্জু চুপ করিয়া রহিল।

সে কিছুক্ষণ যেন আপন মনে কি ভাবিল। পরে ধীরে-ধীরে বলিল—কিছু মনে করিনি নিধুদা, আপনিও কিছু মনে করবেন না। ও কথা আর তুলবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ বেদনাক্লিষ্ট। অল্পক্ষণ পূর্বের সে হালকা সুর আর তাহার কথার মধ্যে নাই।

নিধু অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে কি প্লে করা ঠিক করলে এবার ?

মঞ্জু যেন নিধুর প্রশ্ন শুনিতে পাইল না—সে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার পর হঠাৎ নিধুর মুখের দিকে ব্যথাম্লান ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—নিধুদা, আমার কথা বিশ্বাস করবেন ?

—কি, বল ?

—আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে, আপনি এখান থেকে চলে গেলেই—

নিধু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মঞ্জু বাধা দিয়া বলিল—আরও জানেন, দু-শনিবার আপনি আসেননি, ভেবেছিলুম আপনাকে চিঠি লিখে দিই আসবার জন্যে—কিন্তু বাড়ির কেউ সেটা পছন্দ করত না বলে কিছু করিনি—

—আমার সৌভাগ্য মঞ্জু—কিন্তু সেই জন্যেই মনে হয় আর তোমার সঙ্গে মেশা উচিত নয় আমার—

- কিছু ভাববেন না, নিধুদা। আমি ছেলেমানুষ নই—কষ্ট করতে পারব জীবনে। ও জিনিস কষ্টের জন্যেই হয়। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন সহ্য করতে পারি—

নিধুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তেঁতুলগাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাদুড়দল ডানা ঝটাপট করিতেছিল। সুমুখে আঁধার রাত।

বাড়ি হইতে ফিরিতে নিধুর দেরি হইয়াছিল। বাসায় তালা খুলিতেছে, এমন সময় বিনোদ মুহুরী আসিয়া বলিল—বাবু, এত দেরি করে ফেললেন? প্রায় দশটা বাজে—কেস আছে।

—মক্কেল কোথায়?

—কোর্টের অশথতলায় বসিয়ে রেখেছি—তা আপনি এত বেলা করে ফেললেন।

—চল যাই। এজাহার করিয়ে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, বাবু। আমি তাহলে যাই—বেহাতি হয়ে যাবে। হরিহর নন্দীর দালাল ঘুরচে। আমি ছুটে দেখতে এলাম আপনি এলেন কিনা বাড়ি থেকে—

—টাকা দেবে?

—দু-টাকা দেবে কথা হয়েচে—

—তবে তো ভারি মক্কেল ধরেচ দেখচি—হরিহর নন্দী দু-টাকায় এজাহার করবে?

—বাবু, এক টাকাতেও করবে। আপনি জানেন না—সাধনবাবু আট আনায় করবে। ওই নিরঞ্জন-মোক্তার আট আনায় করবে—আপনার একটু নাম বেরিয়ে গিয়েচে—তাই। আমি যাই বাবু, সামলাই গিয়ে আগে—

পথে নিরঞ্জন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। নিধু বলিল—শুনেচ হে, মক্কেল একে নেই—তার ওপর দালালে বোধ হয় ভাঙিয়ে নেয়—তাই ছুটচি—

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—ছুট না হে, বিনোদ যতটা বলেচে অতটা নয়। কেউ কারো মক্কেল ভাঙায় না ওভাবে।

—কি করে জানব—বিনোদ বললে তাই শুনলাম—

—হরিহরবাবু দালাল লাগিয়ে তোমার-আমার দু-টাকার মক্কেল ভাঙিয়ে নেবেন - সে লোক তিনি নন। ছুট না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—আস্তে আস্তে চল।

—না ভাই, বিশ্বাস নেই কিছু। মক্কেল বেহাতি হয়ে গেলে তখন কেউ দেখবে না—আমি এগুই—

না, মক্কেল ঠিক হাতেই আছে, বিনোদ দাঁত বাহির করিয়া আসিয়া জানাইল। নিরঞ্জন অল্পক্ষণ পরে কোর্টের প্রাঙ্গনে পৌছিয়া বলিল—কি হে হাঁপাচ্চ যে! মক্কেল পেলে?

—হ্যাঁ ভাই—

—ওসব মুহুরীদের চালাকি। কোথায় যাবে মক্কেল? মুহুরীরা কাজ দেখাচ্চে তোমার কাছে। নিজের বাহাদুরি করবার সুযোগ কি কেউ ছাড়ে?

সাধন-মোক্তার দূর হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ও নিধিরাম, বাড়ি থেকে এলে কখন? ভালো সব? শোনো—

—কি বলুন সাধনবাবু—

—ওহে ইণ্টারভিউ-লিস্টে তোমার নাম উঠেচে দেখলাম যে! কে নাম দিলে হে?

—তা তো জানিনে। তবে আমার মনে হয় সাবডেপুটিবাবু—উনিই এস. ডি. ও-কে বলে করিয়েছেন।

—বেশ, বেশ—দেখে খুশি হলাম।

বেলা তিনটার সময় নিরঞ্জন গোপনে নিধুকে বলিল—একটা কথা আছে,

বেরুবার সময় আমার সঙ্গে একা যাবে। জরুরী কথা। কাউকে সঙ্গে নিও না।

—কি এমন জরুরী কথা হে?

—এখন বলব না। কে শুনে ফেলবে।

আরও আধঘণ্টা পরে দুজনে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে—এমন সময় বার-লাইব্রেরীর চাকর ফিরিঙ্গি আসিয়া বলিল - বাবু ছুটি তো এসে গেল—হামার বখশিস্? এবার পুজোতে নিধিরামবাবুর কাছে ধুতি-উতি নিবো। ফিরিঙ্গির বাড়ি ছাপরা জেলায়—আজ প্রায় চল্লিশ বছর রামনগরে আছে—কথাবার্তায় ও চালচলনে যতদূর বাঙালী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব তাহা সে হইয়াছে। ফিরিঙ্গির ছেলে-মেয়েরা বড়-বড় হইয়াছে তাহাদেরও বিবাহ হইয়া ছেলে-মেয়ে হইয়া গিয়াছে; ফিরিঙ্গির বাড়ির ছেলে-মেয়ে ভালো বাংলা বলে।

নিধিরাম বলিল—কেন, এত বড়বাবু থাকতে আমার কাছে কেন রে?

—আপনিও একদিন বড় হবেন বাবু। বার-লাইবিরিতে হামি আজ তিশ বছর নোকরি করছি, কত বাবু এল, কত বাবু গেল। ওই হরিবাবু নেংটি পিন্‌হে এসেছিল—আজকাল বড় সওয়াল-জবাব করনেওয়ালা। সব দেখনু, আপনারও হোবে নিধিরামবাবু। একটা ধুতি নিব আপনার কাছ থেকে—মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে আপনার মোলাকাৎ হবে শুননু শনিবারে—

—তুই কোথা থেকে শুনলি রে ফিরিঙ্গি?

—সব কানে আসে, বাবু, সব শুনতে পাই—

ফিরিঙ্গি হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। আর কিছু আগাইয়া নিরঞ্জন বলিল—তোমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইণ্টারভিউ আছে শনিবারে। তার জন্যে অনেকে তোমার ওপর বড় চটেচে হে—বিগ ফাইভদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছেন। ওঁদের অনেকের নাম ইণ্টারভিউ লিস্টে নেই—অথচ

তুমি জুনিয়ার মোক্তার তোমার নাম উঠল—ভয়ানক চটেচে অনেকে—

নিধু বিস্মিত হইয়া বলিল—তাতে আমার হাত কি হে! তা আমি কি করব।

—সবাই বলে, বড্ড হাকিমের খোশামোদ করে বেড়াও নাকি। চোখ টাটিয়েচে অনেকের। হাকিমে তোমার কথা বেশি শোনে আজকাল—এই সব। বিশেষ করে এই ইণ্টারভিউয়ের ব্যাপারে তুমি কি কারো কারো নাম দিতে বারণ করেছিলে? এ সম্বন্ধে কোনো কথা হয়েছিল তোমার সুনীলবাবুর সঙ্গে?

—আমি! আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন সাবডেপুটি বাবু! আমি বারণ করেছি নাম দিতে!

—অনেকের তাই ধারণা।

—কার-কার নাম দিতে বারণ করেচি?

—এই ধর হরিহর নন্দীর নাম নেই, শিববাবুর নাম নেই—বড়দের মধ্যে। আর ছোটদের মধ্যে তো কারো নাম নেই—এক তুমি ছাড়া।

—তুমি বিশ্বাস কর আমি বারণ করেচি?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসবে যাবে না—কিন্তু বার-লাইব্রেরীর সবাই তোমার ওপর একজোট হলে তোমার বড্ড অসুবিধা হবে। মক্কেলের কানে মন্ত্র ঝাড়বে, জামিন পাবে না—নানাদিক থেকে গোলমাল—

—যদুকাকাও কি এর মধ্যে আছেন নাকি?

নিরঞ্জন জিভ কাটিয়া বলিল—আরে রামোঃ—নাঃ। তা ছাড়া তিনি মানী লোক, তিনি ইণ্টারভিউ লিস্টে প্রথম দিকে আছেন—কোনো ছ্যাঁচড়া কাজে তিনি নেই।

—আমি এর কিছুই জানিনে ভাই। সুনীলবাবু সেদিন বললেন, আপনার

সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব—আমার ইচ্ছে ছিল না। উনি হাকিম মানুষ, অনুরোধ করলেন - কি করি বল। আর আমি দিয়েছি বারণ করে তাঁকে ! নিজের জন্যেই বলিনি, অপরের জন্যে বারণ করতে গেলাম ?

—আমায় বলে কি হবে ভাই ? আমি তো চুনো-পুঁটির দলে। কথাটা কানে গেল তোমাকে বললাম। আমি বলেচি, কারো কাছে যেন বল না হে—

সন্ধ্যার পরে তাহার বাসায় হঠাৎ সাধন-মোক্তারকে আসিতে দেখিয়া নিধু একটু আশ্চর্য হইল। সাধন বলিলেন—এই যে বসে আছ নিধিরাম ? বেড়াতে বার হওনি যে ?

নিধু বুঝিল ইহা ভূমিকা মাত্র। আসল কথা এখনও বলেন নাই সাধন। অবশ্য অল্প পরেই তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাঁহার ইণ্টারভিউ করাইয়া দিতে হইবে নিধিরামের। তাঁহার নামে যেন একখানা কার্ড আসে।

নিধু অবাক হইয়া গেল। সে সাধনকে যথেষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এ ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। এ কি কখনো সম্ভব – সাধনবাবুর মতো প্রবীণ মোক্তার কি একথা ভাবিতে পারেন যে এস.ডি.ও. তাহার মতো একজন জুনিয়ার মোক্তারের পরামর্শ লইয়া লিস্ট তৈরি করিবেন ? এসব কথা ভিত্তিহীন। তাহার কোনো হাত নাই, সে জানেও না কিছু। একথা সাধন কতদূর বিশ্বাস করিলেন তাহা বলা যায় না - বিদায় লইবার সময় বলিলেন—আর ভালো কথা, ওহে আমি আর একটা অনুরোধ তোমায় করচি, এই অগ্রাণে এইবার শুভ কাজটা হয়ে যাক- তোমার আশাতে বাড়িসুদ্ধু বসে আছে। বাড়িতে এদের তো তোমাকে বড্ড পছন্দ – আমায় কেবল খোঁচাচ্চে। কোর্ট বন্ধের দিন তোমায় যেতেই হবে।

নিধু মনে-মনে ভাবিল—বোধ হয় তাহলে বড় ডাল আঁকড়াতে গিয়ে ফসকে গিয়েচে। তাই গরিবের ওপর কৃপাদৃষ্টি পড়েচে আবার। মুখে বলিল—আপনার বাড়ি যাব, সে আর বেশি কথা কি— বলব এখন পরে। তবে ইণ্টারভিউর ব্যাপারে আপনি একেবারে সত্যি জেনে রাখুন সাধনবাবু, ধর্মত বলচি, এর বিন্দুবিসর্গের মধ্যে নেই আমি। বিশ্বাস করুন আমার কথা।

সাধন-মোক্তার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেলেন।

শুক্রবার রাত্রে সাবডেপুটির চাপরাশি আসিয়া নিধুকে ডাকিয়া লইয়া গেল সকালেই।

সুনীলবাবু বলিলেন—খবর সব ভালো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—লালবিহারীবাবুদের বাড়ির সব—চিঠি দিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাল শনিবার যেতে পারব না—পরের শনিবারে যাব—আপনিও থাকবেন। এবার বোধ হয়, আপনাকে বলি—

সুনীলবাবু হঠাৎ সলজ্জকণ্ঠে বলিলেন—বাবা বোধ হয় আসবেন রবিবারে। উনিও মেয়ে দেখতে যাবেন—উনি লিখেচেন—আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

নিধু আড়ষ্ট সুরে বলিল—না, এই—আজকাল কাজের চাপ ছুটির আগে, তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভুগি—

—একটু গরম চা করে দেবে? ও আপনি চা খান না, ইয়ে কোকো খাবেন?

—থাক গে। বরং জল এক গ্লাস—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওরে বাবুকে এক গ্লাশ জল। তারপর শুনুন একটা কথা—

—আজ্ঞে বলুন—

—ভদ্রলোকের কাণ্ড! কি করি—সাধনবাবু সেদিন এসেছিলেন ওঁর বাড়ি আমাকে নিয়ে যেতে মেয়ে দেখতে—শুনেচেন সে কথা? শোনেননি?

—না। আপনি গিয়েছিলেন নাকি?

—যাইনি। আমি ওঁকে খুলে বললুম—কুড়ুলগাছির লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা এগিয়েচে। বোধ হয় সেখানেই—বাবা নিজে আসচেন মেয়ে দেখতে। এ অবস্থায় অন্যত্র আর—

তাই। নিধু আগেই আন্দাজ করিয়াছিল সাধন-বুড়োর দরদের আসল কারণ। কথাটা নিরঞ্জনকে বলিতে হইবে। ওই একজন সমবয়সী বন্ধু আছে রামনগরে—সুখদুঃখের কথা যাহার কাছে বলিয়া সুখ পাওয়া যায়। যে বুঝিতে পারে, দরদ দিয়া শোনে।

শনিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত ইণ্টারভিউ পর্ব বেলা দেড়টার মধ্যে মিটিয়া গেল। মহকুমার অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত। ভিড়ও খুব। এ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে—তৎকালে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে করমর্দন করা সুখবিরল ও যশবিরল পৃথিবীর একটা প্রধান সুখ, একটা প্রধান সম্মান। ম্যাজিস্ট্রেট আহেলা বিলাতী আই সি.এস.। নাম রবিনসন—লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। চেহারার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

এস.ডি.ও. হাসিয়া নিধুকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন—বাবু নিধিরাম চৌধুরী—মুক্টিয়ার—

ঠিক পূর্বে সরিয়া গিয়াছেন লোকাল বোর্ডের মেম্বর শশিপদ বাবু। সাহেব সহাস্যবদনে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—গুড্ আফটারনুন, বাবু, সো গ্ল্যাড্ টু মিট ইউ—

নিধু ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে হাত বাড়াইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নিচু করিয়া সেলাম ঠুকিল। মুখে বলিল—গুড্ আফটারনুন, স্যর—ইয়োর অনার—

ম্যাজিস্ট্রেট তাহার দিকে চাহিয়া ভদ্রতা-সূচক হাসিলেন। ইণ্টারভিউ শেষ হইয়া গেল।

আজ আর কাজকর্ম নাই।

ডাক-বাংলা হইতে বাসায় আসিবার পথে নিধু ভাবিয়া ঠিক করিল আজ সে কুড়ুলগাছি যাইবে। যদিও বলিয়া আসিয়াছিল যাইবে না, কিন্তু যখন সকালে-সকালে কাজ মিটিয়া গেল—তখন আজই এখনি বাহির হইয়া

পড়িতে হইবে। সামনের শনিবারে বরং যাইবে না বাড়ি—সুনীলবাবু এবং তাঁহার বাবা যেদিন মেয়ে দেখিতে যাইবেন—সেদিন তাহার না থাকিলেও কোনো পক্ষের ক্ষতি নাই।

আজ শরীরটা কিন্তু সকাল হইতেই ভালো নয়। জ্বরজ্বারি হইতে পারে। সারা গায়ে যেন বেদনা। তবুও বাড়ি আজ তাহার যাওয়া চাই। আজ মঞ্জুকে সে পাইবে পুরোনো দিনের মতো। বাড়িতে ভাবী আত্মীয় কুটুম্বেরা ভিড় করিবে না আজ।

শরতের রৌদ্র নীল আকাশের পেয়ালা বাহিয়া উপচাইয়া পড়িতেছে। পথের ধারে ছায়া, ঝোপে সেই দিনের মতো মটরলতার দুলুনি। ছোট গোয়ালে-লতায় ফুল ধরিয়াছে। শালিক ও ছাতারে পাখির কলরব মাথার উপরে।

পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াই নিধু দেখিল তাহার শরীর যেন ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। শরতের ছায়াভরা বাতাস গায়ে লাগিলে যেন গা শিরশির করে। নিধু মাঝে-মাঝে কেবলই বসিতে লাগিল—এ সাঁকোয় বসে, আবার ও সাঁকোয় বসে। সাঁকোর নিচেই গত বর্ষার বদ্ধ জল, অন্য সময় তাহার যে একটা গন্ধ আছে—ইহাই নিধুর নাকে লাগিত না—আজ গন্ধটায় তাহার শরীরের মধ্যে যেন পাক দিতেছিল। সাঁকোয় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে বাঁশবনের মাথার উপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশে শরতের শুভ্র মেঘের খেলা লক্ষ্য করিতেছিল। মেঘের দল লঘুগতিতে উড়িয়া চলিতে-চলিতে কত কি জিনিস তৈরি করিতেছে—কখনো দুর্গ, কখনো পাহাড়, কখনো সিংহ, কখনো বহুদূরের কোন অজানা দেশ—উপরের বায়ুস্রোত আবার পর-মুহূর্তে সেগুলোকে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে—এই আছে, এই নাই—আবার নব-নব শুভ্র মেঘসজ্জা, আবার কল্পনার কত কি নতুনের সৃষ্টি। ভঙ্গুর মেঘের সৃষ্টি—সে আবার টেকে কতক্ষণ?

কে একজন ডাকিয়া বলিল—বাবু, আপনি এখানে শুয়ে আছেন সাঁকোর ওপর ? কনে যাবেন ?

পথে চলতি চাষা লোক। নিধু বলিল—যাব কুড়ুলগাছি। জ্বর এসেচে তাই একটু শুয়ে আছি।

—আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবানু, উঠুন আপনি—কতক্ষণ শুয়ে থাকবেন ?

—না বাপু। আমি একটু জিরিয়ে নিলেই আবার ঠিক হাঁটব—তুমি যাও।

লোকটা চলিয়া গেল—কিন্তু যাইবায় সময় বার-বার পিছনে তাহার দিকে চাহিতে-চাহিতে গেল। লোকটা ভালো। শরীর ভালো না থাকিলে কিছুই ভালো লাগে না। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ইণ্টারভিউ হইল—কোথায় মন বেশ খুশি হইবে, গাঁয়ে গিয়া গল্প করিবার মতো একটা জিনিস হইল—তা না সে যেন মনে কোনো দাগই দেয় নাই। কিন্তু এই জ্বরের ঘোরে মঞ্জু যেন কোন অপার্থিব দেশের দেবী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিতেছে। মঞ্জুদের একদিন খাওয়ানো হইল না—পয়সা জমে না হাতে তা কি করা যায় ? সামনের শনিবারে তো বাড়ি যাইবে না—পরের শনিবারে হইবে। আচ্ছা, বার-লাইব্রেরীর সকলে কি তাহাকে বয়কট করিবে ? যদি করে সে তো নিরুপায়। তাহার কোনো দোষ নাই, আর কেউ না জানে, সে তো জানে ? সে স্বেচ্ছায় কাহারো অনিষ্ট করিতে যাইবে না।

অতি কষ্টে আরও কয়েক মাইল পথ সে অতিক্রম করিল।

পথ তাহাকে যে করিয়াই হোক, অতিক্রম করিতেই হইবে। এই দীর্ঘ, ক্লান্ত পথের ওপ্রান্তে হাস্যমুখী মঞ্জু যেন কোথায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আজ না গেলে আর তাহার সহিত যেন দেখাই হইবে না। দুদিনের জন্য আসিয়াছিল—আবার বহু, বহু দূরে চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার আর দেরি নাই। ওই সন্দেশপুর—সেই [illegible]

পাঠশালা সন্দেশপুর বাঁওড়ের ধারে। বাঁওড়ের বর্ষার জল [illegible] ছুঁইয়াছে—ওদিকে গাছের গুঁড়ির সাঁকোর উপর দিয়া ধান বোঝাই মহিষের গাড়ি পার হইতেছে।

আর এইটুকু গেলেই তাহাদের গ্রাম। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামের পথে সে পা দিবে।

অমনি মা আগাইয়া আসিয়া বলিবে—এই যে নিধু এলি বাবা! বলেছিলি আজ যে আসবিনে?

হয়তো সে বাড়ি পৌঁছলে একথা তাহার মা তাহাকে বলিয়াও থাকিবেন—কিন্তু আচ্ছন্ন ঘোর-ঘোর ভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন সে বাড়ি ঢুকিয়াছিল টলিতে-টলিতে—কখন বাড়ির লোকে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছিল—এ সকল কথা তাহার মনে নাই।

দুইমাস রোগের ঘোরে কখনও চেতন, কখনও অচেতন বা অর্ধচেতন ভাবে কাটিবার পর নিধুর জীবনের আশা হইল। ক্রমে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে পারিল। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে আর ভয় নাই।

নিধুর মা পুত্রের সেবা করিতে-করিতে রোগা হইয়া পড়িয়াছেন। সে চেহারা আর নাই মায়ের।

নিধুর সামনে সাবুর বাটি রাখিয়া বলিলেন—আঃ বাবা, রামগর থেকে শশধরবাবু ডাক্তার পর্যন্ত এসেছিলেন দুদিন—

নিধু ক্ষীণ স্বরে বলিল—শশধরবাবু! সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!

—টাকা কি লেগেছে আমাদের? আহা, আর জন্মে পেটের মেয়ে ছিল ওই মধু—দিন রাতের মধ্যে যে কতবার আসত, বসে থাকত—সেই তো সব যোগাড়যন্ত্র করে দিলে জজবাবুকে বলে—জজবাবুও হামেসা আসতেন—গাঁয়ের সবাই আসত-যেত। সেদিনও জজগিন্নি বলে গেলেন—টাকা খরচ